

জানুয়ারি, ১৮৮৮।

ষষ্ঠ বর্ষ।



আজ আমাদের কি সুখের দিন। "সখা" দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাল বালক বালিকাদের বন্ধুর কাজ করিয়া আজ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাহাতে বালক বালিকাদের মনে সুরুচির ভাব উদিত হয়, যাহাতে তাঁহারা অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে ভালবাসে, যাহাতে তাহারা বিদ্যাভ্যাসে রত হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জনক্ষম হয়, যাহাতে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাদের মন আনন্দিত করিতে শিক্ষা করে, যাহাতে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে মন প্রস্তুত করে—ইহাই 'সখা'র প্রধান উদ্দেশ্য। এই কয়েক বৎসরে সকল কর্ত্তব্য পালনেই যে 'সখা' কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা যে, এই পাঁচ বৎসর কাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। সমস্ত বঙ্গদেশের বালক বালিকাদের মন গঠিত করা, ভাল দিকে আকৃষ্ট করা এক সংবাদ পত্রের উপদেশ দ্বারা অসম্ভব। তবে, যাহারা 'সখা'র গ্রাহক হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 'সখা'র উপদেশ মত কাজ করিলেই "সখা"র জন্ম সফল হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে।

দুই জন বালক-গ্রাহক 'সখা' পরিচালন সম্বন্ধে নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা এই স্থানে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'সখা'র দোষ কেহ দেখাইয়া দিলে আমরা তাহা অবনত মস্তকে সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু কেহ অন্যায় রূপ দোষারোপ করিলে তাহাও আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। এক জন আমাদের নিকট লিখিয়াছেন যে, আমরা 'সখা'র অর্থোন্নতির দিকেই বেশী আকৃষ্ট,—'সখা'র দ্বারা মাসে মাসে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি, কিন্তু কিসে 'সখা' বালকদের সখার কাজ করিবে সে দিকে মন দিতেছি না। আরও লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণনগর হইতে যে একটী বালক একটী প্রবন্ধ 'সখা'য় প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত না হইয়া অন্য এক জনের রচনা প্রকাশিত হইল কেন?

এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর এস্থানে দেওয়া আবশ্যক। আমাদের অনুমানে বোধ হয় যে, এই বালকটীই প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে ছিলেন। সে স্থান

হইতে ইনিই একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রবন্ধ প্রকাশ করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। উপযুক্ত না হইলে আমরা প্রকাশ করি না। বালক বালিকাদের প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করিবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু যে রচনা পাঠে অন্য গ্রাহকের উপকার হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই সেরূপ রচনা আমরা প্রকাশ করি না। যে সমুদয় বালকেরা 'সখা'য় কোন রূপ রচনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের দুইটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—প্রথমতঃ বিষয়টী এরূপ হওয়া চাই যে, তাহা পাঠে অন্যান্য গ্রাহকদের উপকার হইবার সম্ভাবনা; এবং দ্বিতীয়তঃ রচনাটীর ভাষা সরল হওয়া চাই। যাহারা এই দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন তাহাদের প্রবন্ধ সাদরে গ্রহণ করিব।

এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। 'সখা'র দ্বারা এই পাঁচ বৎসরে একটী কাণা কড়িও লাভ হয় নাই। এই বালককে আমরা আরও বলিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারি যে, এই কয়েক বৎসরে 'সখা'য় প্রায় ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে। 'সখা'র যে রূপ গ্রাহক সংখ্যা, এবং ইহার যেরূপ বাৎসরিক মূল্যের হার—ইহা দ্বারা ইহার মাসিক ব্যয় কোন মতেই নির্ব্বাহ হয় না। মাসে মাসে প্রায় ১০০৲ টাকা করিয়া আমাদের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

'সখা'র দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। 'সখা'র উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। 'সখা'র খরচ নির্ব্বাহ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং কিসে ভবিষ্যতে ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয় এজন্য প্রত্যেক বিবেচক কার্য্যাধ্যক্ষের উপায় অবলম্বন করা উচিত। যেমন এক দিকে 'সখা'কে বালক বালিকার প্রকৃত বন্ধুর মত করিবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, নানাদেশের নানারূপ গল্প, নূতন নূতন ছবি, ম্যাপ ইত্যাদি দ্বারা গ্রাহকদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেছি, অন্য দিকে আবার সেইরূপ যত্নের সহিত যাহাতে ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয় তাহার চেষ্টাও করিতে হইতেছে। অর্থ ভিন্ন 'সখা'র আরও উন্নতি করা অসম্ভব। আশা করি আমাদের সমুদয় ঋণ এই বৎসরে শোধ হইয়া যাইতে পারে।

বিলাতে এই রূপ অনেক কাগজ আছে। তাহা হয়ত গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। কোন কোন কাগজের গ্রাহক সংখ্যা লক্ষাধিক। যে কাগজের গ্রাহক সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী তাহার উন্নতি যে দিন দিন হইবে তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? বিলাতে খবরের কাগজ পড়া সকলেরই দৈনিক কাজ। আমরা যেমন প্রত্যহই মাছ, ডাল, তরকারী ইত্যাদি কিনিবার জন্য নগদ পয়সা দিয়া চাকরকে বাজারে পাঠাই, বিলাতের প্রত্যেক গৃহস্থই বাজার সামগ্রী ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন নূতন পুস্তক বা খবরের কাগজ কিনিবার জন্যও চাকরকে পয়সা দেন। যাহারা ধনী তাহারা বার্ষিক চাঁদা একেবারে দিয়া বাড়ী বসিয়াই খবর কাগজ পড়েন, আর যাহারা দরিদ্র তাহারাই প্রত্যহ নগদ পয়সা দিয়া বাজার সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ ক্রয় করিয়া পড়েন। গাড়োয়ান পর্য্যন্ত কোচ বক্সে চড়িয়া, দোকানদারেরা দোকানে বসিয়া খবরের কাগজ পড়ে। যে দেশের আপামর সাধারণ লোকের পড়ার প্রতি এরূপ অনুরাগ, সে দেশের খবরের কাগজের উন্নতি না হওয়াই অসম্ভব।

আর আমাদের দেশের কথা ভাব। সমস্ত

বঙ্গদেশে 'সখা'র মত আর দ্বিতীয় কাগজ নাই। কত কাগজ বাহির হইল সকলই গ্রাহকাভাবে উঠিয়া গেল। বহুদিন হইল কেশব বাবু "বালক-বন্ধু" বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা গ্রাহকাভাবে উঠিয়া গেল। ঠাকুর বাড়ী হইতে "বালক" বাহির হইয়া তাহাও গ্রাহকাভাবে উঠিয়া গেল। ইহা ভিন্ন আরও দুই এক খানি ছোট রকমের কাগজ বালক বালিকাদিগের জন্য কয়েক দিনের জন্য মাত্র দেখা দিয়াছিল; কিন্তু বেশী দিন টিকিতে পারে নাই।

এখন কেবলমাত্র "সখা"ই বঙ্গদেশে বালক বালিকাদের সখার কাজ করিতেছেন। এই পাঁচ বৎসর এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহার গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ করা যাইতেছে না। এদেশে এখনও সংবাদ পত্র পড়িবার আবশ্যকতা সাধারণ লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। এই জন্যই এত দুরবস্থা।

আর একজন গ্রাহক লিখিয়াছেন যে,এই পাঁচ বৎসরকাল তিনি "সখা"র গ্রাহক আছেন, কিন্তু অন্যান্য সংবাদ পত্রের গ্রাহকদের ন্যায় উপহার পাইলেন না। এই দুঃখে দুঃখে তিনি গ্রাহক-শ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়া লইলেন। এইরূপ শ্রেণীর লোককে আমরা এই বলিতে চাই যে, নানারূপ বাহ্যিক প্রলোভন দ্বারা গ্রাহক করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। 'সখা'য় লিখিত উপদেশ দ্বারা গ্রাহকদের মন সুপথে পরিচালিত হইবে, বালকেরা "সখা"র প্রবন্ধাদি পড়িয়া নিজের উন্নতি করিবে, 'সখা' পড়িয়াই 'সখা'র গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবে এই আমাদের ইচ্ছা। অন্যান্য প্রলোভন কিছুই নাই।

যে মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় এই পাঁচবৎসর কাল নানারূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া "সখা" ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিতেছেন তাঁহাকে এই নূতন বৎসরে প্রণাম করি। আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে এ নূতন বৎসরে আরও নূতন উৎসাহে 'সখা'র অনেক উন্নতি দেখিতে পাইব।



অন্ধের চক্ষু।



গরের বাহিরে অতি অল্প দূরেই একটী সামান্য পল্লী। পল্লীটী অতি সামান্য, এখানে ধনীর বসতি নাই;—কেবল কতকগুলি দরিদ্র লোক এখানে বাস করে। এই পল্লীর মধ্যে একটী কুটীরের দিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী বালক এবং একটী বালিকা, এক বৃদ্ধের হাত ধরিয়া সেই কুটীরের সম্মুখে উদ্যানে বেড়াইতেছে। বালকের বয়স চৌদ্দ, বালিকার বয়স দশ। কুটীর খানি অতি সামান্য, কিন্তু কুটীরের সম্মুখের উদ্যানটী অতি সুন্দর; নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল ও নানাবিধ ফলে পরিপূর্ণ, দেখিলেই বোধ হয় যে, অতি যত্নের সহিত উদ্যানটী তৈয়ার করা হইয়াছে।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ঐ সামান্য

পল্লীতে আজ যে চিত্র দেখিলে, দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল না। যাঁহাকে আজ বয়সের ভারে অবনত দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কত শক্তি সামর্থ্য ছিল। আজ যাঁহার মস্তকের সমস্ত কেশ সাদা দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একটী কেশও সাদা হয় নাই। আজ যাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখিতেছ, যাঁহার মুখ কালিমা মাখা দেখিতেছ, দশ বৎসরের পূর্ব্বে সেই মুখখানি কত সুন্দর—কত প্রফুল্ল ছিল। আর চাহিয়া দেখ—যে চক্ষু আজ কোটরগত—জ্যোতি-হীন দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই চক্ষু কত সুন্দর জ্যোতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু মানুষের আজ যাহা আছে, কাল আর তাহা থাকিবে না, কালও যাহা থাকিবে, তার পর দিন আবার তাহাও থাকিবেনা, এই রূপে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা সকল হারাইতেছি।

কেন, কি চিন্তায় ইহাঁর ললাটে আজ এ গভীর রেখা পড়িয়াছে, কিসের জন্য ইহাঁর মুখ কালিমা মাখা হইয়াছে, চক্ষু কোটরগত জ্যোতিহীন হইয়াছে? পূর্ব্ব কথা,—এবং এই দুটী বালক বালিকার চিন্তা। আজ যাঁহাকে পর্ণকুটীরবাসী দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বৃহৎ অট্টালিকার অধীশ্বরী ছিলেন। কত দাস দাসী ইহাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল,ধন ঐশ্বর্য্যে ইহাঁর গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না; দশ বৎসর পূর্ব্বে যিনি অট্টালিকাবাসী ছিলেন, আজ তিনি পর্ণকুটীরবাসী; শত দাস দাসী যাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত, আজ তাঁহাকে উদরান্নের জন্য নিজের হাতে কাজ করিতে হয়। কিন্তু এ চিন্তা অপেক্ষাও তাঁহার অধিক চিন্তা, এই দুটী বালক বালিকার জন্য;—ইহাদিগের কি উপায় হইবে! বালিকাটীর জন্মের অল্প পরেই তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে; এক বৃদ্ধ পিতা ভিন্ন ইহাদের আর কেহ নাই। বৃদ্ধ ভাবিতেছেন তাঁহার মৃত্যুর পর ইহারা কাহার কাছে যাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে।

কিন্তু বৃদ্ধ এ চিন্তা হইতে শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইলেন; আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দুই বৎসর পরে বালক বালিকা দুটীকে অনাথ করিয়া বৃদ্ধ সংসার হইতে বিদায় লইলেন। পিতাকে হারাইয়া ইহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, সেই দিন হইতে ইহারা অকূল সমুদ্রে ভাসিল। কিন্তু দুঃখে লালিত পালিত হইয়া,দুঃখের মধ্যে জন্মিয়া ইহাদিগের,—বিশেষতঃ বালিকাটীর যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল। দুঃখই আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দেয়, যে সুখের মধ্যে লালিত পালিত হয়, সে প্রায়ই প্রকৃত শিক্ষা পায় না। দুঃখকষ্ট ধীর ভাবে কি প্রকারে সহ্য করিতে হয়, তাহা ইহারা শিখিয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে ইহারা অনাথ হইল বটে, কিন্তু ধীর ভাবে তাহা সহ্য করিবার সংকল্প করিল। শান্তি এই অল্প বয়সেই গৃহকার্য্য শিখিয়াছিল। মেয়েটীর নাম শান্তি, বৃদ্ধ দারুণ শোকের সময় ইহাকে পাইয়া, কতক শান্তি পাইয়াছিলেন, তাই ইহার নাম শান্তি রাখিয়াছিলেন। ছেলেটীর নাম সতীশ। সতীশ পরিশ্রম করিয়া যে সামান্য অর্থ আনিয়া দিত; শান্তি তাহা দ্বারাই কোন প্রকারে দিন চালাইত। ভাই বোনের মধ্যে অতিশয় ভালবাসা ছিল; উভয় উভয়কে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিত, সুতরাং অন্য দিকে অনেক কষ্ট থাকিলেও ভাই বোনে মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। এই রূপে দিন যাইতে লাগিল,—একটী বোঁটায় দুটী ফুল ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়া চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ভাই বোনে বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময় এক স্থানে একটী খুব সুন্দর ফুল দেখিয়া শান্তি বলিল, "দাদা আমাকে ঐ ফুলটী আনিয়া দাও না।" সতীশ অমনি ফুলটী আনিবার জন্য দৌড়িলেন, বোনকে ফুলটী দিয়া সুখী করিবেন। ফুলটী কতকগুলি কাঁটাগাছের মধ্যে ফুটিয়া ছিল, সতীশ তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গেল, এবং তাহাতে তাহার গায়ে এবং দুই চক্ষে কাঁটা বিদ্ধ হইল। ফুল আর তোলা হইল না। শান্তি কোন মতে সতীশকে লইয়া কুটীরে আসিল, এবং দাদার অবস্থা ও যন্ত্রণা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। সতীশের অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, কিন্তু শান্তির কষ্ট হইবে বলিয়া সে কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া, শান্তিকে বুঝাইতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু শান্তি কিছুতেই বুঝিল না। পাড়ার লোকেরা, বিশেষতঃ এক ব্যক্তি ইহাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিত। চিকিৎসক আনিয়া, তখনই ইহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সতীশ অল্প দিন পরেই আরোগ্য হইল বটে; কিন্তু জন্মের মত চক্ষু দুটী হারাইল। এ ক্লেশ শান্তির বুকে গাঁথা হইয়া রহিল, তাহার জন্যই যে সতীশ চক্ষু দুটী হারাইল,তাহা আর সে ভুলিল না। এই অল্প বয়সেই বালিকার প্রফুল্ল মুখ খানিতে বিষাদের ছায়া পড়িল, তাহার ললাটে চিন্তার রেখা পড়িল। সতীশ আর এখন কোন কাজ করিতে পারে না; শান্তিই পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতেই কোন মতে দিন কাটে। সেই অবধি সতীশের সকল কাজই শান্তি করে, সতীশকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করে। যেখানে যায়, সতীশের হাত খানি ধরিয়া লইয়া যায়; সন্ধ্যার সময় সতীশের হাত খানি ধরিয়া বাগানে বেড়াইতে লইয়া যায়। তখন পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া শান্তি কতই না কষ্ট পায়। এখন শান্তিই অন্ধের চক্ষু। সতীশ চক্ষু হারাইয়াও শান্তির যত্নে ও স্নেহে কোন অভাবই বুঝেন না।

এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। জন্মিয়া অবধি দুঃখের উপর দুঃখ পাইয়া, এবং কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে বালিকার শরীর ভগ্ন হইল, —কঠিন যক্ষ্মা রোগ বালিকাকে আক্রমণ করিল। এই দুঃসময়ে সেই ব্যক্তি, এই অনাথ বালক বালিকাকে তাহার নিজ গৃহে লইয়া গিয়া, যত্নের সহিত বালিকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। রোগের অসহ্য যাতনায়ও শান্তি দাদার কথা বিস্মৃত হয় নাই। সে জানিত তাহার মৃত্যু নিকট, সেই জন্য সে আরও আকুল হইল। তাহার মৃত্যু হইলে আর কে তাহার দাদাকে এমন করিয়া সেবা করিবে, দাদাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিবে? ক্রমে আরও কিছুদিন গেল, শান্তিরও শেষ দিন উপস্থিত হইল,—শান্তির চক্ষের জ্যোতিঃ নিভিল। অন্ধ হইয়াও সতীশ এতদিন তাহা যেন অনুভব করিতে পারে নাই; আজ সে "অন্ধের চক্ষু" হারাইল। এক বোঁটায় দুটী ফুল ফুটিয়াছিল, একটী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। স্নেহের যে শেষ বন্ধন ছিল, সতীশ তাহা আজ হারাইল।

আরও ১০ দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ আর সেই কুটীরের সম্মুখের উদ্যানে সেই দুটী বালক বালিকাকে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু এখনও প্রতি দিন দেখিতে পাইবে, সন্ধ্যার সময় একজন শান্তির সমাধির ধারে বসিয়া রহিয়াছে, আর তাহার অন্ধ চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রুজল সেই সমাধির উপর পড়িতেছে!

ঠগী।

আমরা বাঙ্গলার ঠগীদিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া ঠগীদিগের কথা শেষ করিব। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই ঠগদিগের অত্যাচার খুব বেশী ছিল। এই সকল স্থানে ঠগদিগের যে প্রকার প্রতাপ ছিল, বেহার ও বাঙ্গলায় ততদূর ছিল না। দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কেবল মাত্র স্থল পথেই ঠগীর অত্যাচার ছিল। কিন্তু বেহার বিশেষতঃ বঙ্গে, স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই ইহাদিগের অধিক প্রতাপ ছিল। গঙ্গা নদীর মোহানা ডায়মণ্ড হারবার হইতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই ইহাদিগের চলাচল ছিল। তা ছাড়া বাঙ্গলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায়ও জলপথে ইহাদিগের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঠগদিগের মত বাঙ্গলার ঠগেরাও এক একজন দলপতির অধীন হইয়া চলিত। ইহারা নৌকায় থাকিয়া এই নৃশংস কার্য্য করিত। এক একজন দলপতির অধীনে পাঁচ সাত খানি হইতে পোনের ষোল খানি পর্য্যন্ত নৌকা থাকিত। এই সকল নৌকায় পাঁচ সাত জন বা আরও বেশী লোক থাকিত, ইহারা সকলেই ঠগ। ইহারা নানা বেশে নানা স্থানে থাকিত। কোথাও ব্যবসায়ী নৌকা বলিয়া পরিচয় দিত, দলের কতক লোক ব্যবসায়ীর বেশ ধরিত, অন্য সকলে নৌকার দাঁড়ী মাঝি হইত। কোন স্থানে দলের কতক লোক যাত্রীর বেশ ধরিয়া যাত্রীর নৌকা বলিয়া পরিচয় দিত। ইহা ভিন্ন এই সকল নৌকা যাত্রীদিগকে তীর্থে এবং অন্য কোন গ্রাম বা নগরে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তখন রেলপথ ছিল না, নৌকারই অধিক চলন ছিল, অনেক স্থানে এখনও রহিয়াছে। পথ হাঁটিবার ক্লেশের ভয়ে অনেকে নৌকায়ই যাতায়াত করিত। এবং এই সকল নৃশংসদিগের হাতে পড়িয়া জীবন হারাইত।

দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় বাঙ্গলায় ঠগদিগের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই লোক ছিল। বাঙ্গলার ঠগদিগের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার মুসলমান, বর্দ্ধমান জেলার কায়স্থ এবং মুরশিদাবাদ অঞ্চলের মালো জাতিই অধিক ছিল। মুঙ্গেরের নিকট এক স্থানে তিন জন বাঙ্গালী ঠগ ধরা পড়ে। এই তিন জনের নাম, গঙ্গাহরি মিত্র, মাধব এবং কানাই; ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গাহরি মিত্র একজন অতি প্রসিদ্ধ ঠগ ছিল। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। অবশেষে ইহারা আপনাদিগের দোষেই ধরা পড়ে। মুঙ্গেরের কাছে, দরিয়াপুর নামক স্থানে একদিন মাধব একটা বাঁশের চোঙ্গ হাতে লইয়া দৌড়িয়া একটা সরাইএ উপস্থিত হয়; গঙ্গাহরি এবং কানাইও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধব বলে যে, ঐ দুই ব্যক্তি ঠগ, তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে। ঐ বাঁশের চোঙ্গে কতগুলি টাকা আছে, ইহা তাহারা জানিতে পারিয়া তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। গঙ্গাহরি ও কানাই বলে যে, ঐ ব্যক্তি তাহাদের নৌকা হইতে ঐ টাকা চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে। ইহাদিগকে এই প্রকার গোলযোগ করিতে দেখিয়া এবং ইহাদিগের কথা বার্ত্তায়

একটু একটু সন্দেহ হওয়াতে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ইহারা ধৃত হইলে পরে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাধব, গঙ্গাহরি এবং কানাইকে ঐ টাকা হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, অবশেষে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইল।

কাপ্তেন লুইস্ সোনাতন দাস নামক বর্দ্ধমান অঞ্চলের আর একজন বিখ্যাত ঠগকে ধৃত করেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যখন ঠগীদিগের অত্যাচারের বিষয় গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেন; তখনই এই ভয়ঙ্কর নৃশংস কাণ্ড যাহাতে রহিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রদেশে প্রদেশে ঠগীর অত্যাচার দূর করিবার জন্য এবং ঠগীদিগকে দমন করিবার জন্য কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইল। ইহাঁদিগের চেষ্টায় ও যত্নে ঠগীর অত্যাচার ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, এবং অবশেষে বেণ্টিঙ্কের সুশাসনে একেবারেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। তখন একটা রীতি এই ছিল যে, বিখ্যাত ঠগীদিগকে প্রায় কখনও প্রাণবধ করা হইত না। ইহার একটা উদ্দেশ্য ছিল, ইহাদিগের নিকট গভর্ণমেণ্ট অনেক সাহায্য পাইতেন। যে সমস্ত ঠগ ধৃত হইত তাহাদিগের হয় প্রাণবধ করা হইত, না হয় যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠান হইত। কিন্তু প্রধান প্রধান ঠগেরা নিজেরা যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে, তাহা এবং অন্যান্য ঠগদিগের সন্ধান বলিয়া দিবে এমন প্রতিজ্ঞা যাহারা করিত, তাহাদিগকে আর ফাঁসি দেওয়া হইত না। কিন্তু ইহারা স্বাধীনতাও পাইত না। সর্ব্বদা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের চক্ষে চক্ষে থাকিত; কারণ একবার ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, আবার দল বল সংগ্রহ করিয়া নরহত্যায় লিপ্ত হইত। গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগের সাহায্য না পাইলে কিছুই করিতে পারিতেন না, ঠগীদিগের দমন করা অসাধ্য হইত। ইহাদিগের নিকট সন্ধান পাইয়া, ইহারা ঘরের কথা বলিয়া দেওয়াতেই, গভর্ণমেণ্ট এত শীঘ্র এই নৃশংস কাণ্ড রহিত করিতে পারিয়াছিলেন, নতুবা ঠগীদিগের ভয়ে হয়ত আজও আমাদিগকে কাঁপিতে হইত। বর্দ্ধমানে রামলোচন সেন নামক আর একজন বিখ্যাত ঠগ ছিল; অনেক চেষ্টাতেও গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু এই রামলোচনের মাতুল শঙ্কর সরকারকে গভর্ণমেণ্ট ধৃত করিয়াছিলেন। কাপ্তেন লুইস্ বলেন যে বাঙ্গলার ঠগদিগের মধ্যে শঙ্কর সরকারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং বিখ্যাত।

পাবনা জেলার কায়স্থ ঠগেরা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইহাদিগের অনেক মুসলমান অনুচর ছিল। ইহারা ঢাকা, ফরিদপুর, এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় ঠগদিগের সহিত একত্র হইয়া, ভগবানগোলা এবং কুমিল্লার মধ্যবর্ত্তী, গঙ্গার তীরবর্ত্তী সকল স্থানে, এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার সকল স্থানেই এই নৃশংস কার্য্য করিয়া বেড়াইত। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ঠগদিগের মধ্যে স্বরূপ দত্ত-নামে এক জন বিখ্যাত ঠগ ছিল।

আমরা সংক্ষেপে ঠগীদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে গেলে, "সখা"র স্থান হয় না। সামান্য যাহা লেখা হইল ইহাতে 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের তৃপ্তি হইল কি না জানি না। ঠগীদিগের সম্বন্ধে এমন সকল বিস্ময়কর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প আছে, যে তাহা যতই শোনা যায় ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়। সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক লিখিলে কৌতূহল নিবৃত্তি হইতে পারে। আজ ঠগদিগের

নৃশংস কাণ্ড আমাদিগের নিকট গল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এমন দিন ছিল, যে সময় ঠগীর নামে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা, এবং কচ্ছ হইতে আসাম, এই বিস্তীর্ণ ভারতের এমন স্থান ছিল না, যেখানে ইহাদিগের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড অবিশ্রান্ত চলে নাই। অনেক স্থলে ধনী, জমীদার, বা বণিজ্য-ব্যবসায়ী, এবং নিম্নশ্রেণীর পুলিশের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ইহার প্রশ্রয় দিতেন; তাহা না হইলে ঠগীর অত্যাচার এতদূর বৃদ্ধি হইতে পারিত না। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে আজ সে সমস্ত অত্যাচার গিয়াছে, সমস্ত অত্যাচার দূর হইয়াছে।



সোণার খনি।

বোধ হয় সকলেই সোণা দেখেছে। অনেকের ভাগ্যে সোণার মোহর দেখা না ঘটিতে পারে কিন্তু সোণার নানারূপ অলঙ্কার অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের না থাকিলেও পরের গায়ের গয়না দেখিয়া চক্ষুর সার্থকতা হইতে পারে। লোকের নিকট এই সোণার কত আদর তাহা সকলেই জান। অনেক মা, ছেলেকে আদর ক'রে "সোণা" "মনি" আরও কত কি বলিয়া ব'লে থাকেন, ইহাতেই বুঝা যায় সংসারে সোণার কত আধিপত্য। এখন একথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সোণার এত আদর কেন? সোণারই বা এত আদর কেন, এবং অধিক উপকারী হইয়াও লৌহেরই বা এত অনাদর কেন? যাহারা "স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ" পড়িয়াছে তাহারা সম্ভবতঃ লৌহের পক্ষই সমর্থন করিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণের অনেক বেশী আদর। ইহা হইবার দুইটী কারণ আছে। ১ম,—স্বর্ণ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, যাহা অল্প পাওয়া যায় এবং পাইতে কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহার আদর বেশী। একথা বুঝিতে বড় গোল হইবে না একটা দৃষ্টান্ত দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। আমরা প্রতিদিন দুইবেলা (অনেকে তিন বেলাও) ভাত খাই সুতরাং ভাত অতিশয় আবশ্যকীয় হইলেও তাহার বড় আদর নাই কিন্তু যে দিন লুচি কি পোলাও হয় সে দিন ছেলে বাবুদের আর আনন্দ ধরে না। সে দিন যেন বছরের একদিন। ২য়,—স্বর্ণের সৌন্দর্য্য ও এই সৌন্দর্য্যের স্থায়ীত্ব। সুন্দর পদার্থ দেখিলে আমরা আদর করি; একটা সুন্দর ফুল দেখিলে কতই আনন্দ হয়। তার পরে সেই সৌন্দর্য্য যদি চিরস্থায়ী হয় তবে আরও কত আনন্দ! লোকে কত অসংখ্য বার চাঁদ দেখে—প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য দেখে—তথাপি তাহাদের সৌন্দর্য্যের আদর কমে না। এই জন্যই সোণার এত আদর।

আর আর ধাতু দ্রব্যের যেমন মাটির নীচে আকর পাওয়া যায় সেরূপ সোণারও পাওয়া গিয়া থাকে কিন্তু অনেক সময়ে পাহাড়ের গায়ে সমুদ্র ও নদীর তীরে, বালি ও কর্দ্দমের মধ্যেও সোণা পাওয়া যায়। এক রকম প্রস্তরের আকরের মধ্যেও সচরাচর সোণা দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে সোণা পাওয়া যায় সেখানকার মাটী

কতকটা শক্ত শক্ত পাহাড়ের ন্যায়। যাহারা সোণা তুলিয়া থাকে তাহারা স্থান দেখিয়াই বুঝিতে পারে সেখানে সোণা পাওয়া যাইবে কি না।

আজকাল অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্ণিয়া প্রদেশেই যথেষ্ট পরিমাণে সোণা পাওয়া যায়। অল্পদিন হইল এখানে স্বর্ণের আকর আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আসিয়াস্থ কসিয়া, হঙ্গেরী, ব্রাজিল এবং ট্রান্সলভেনিয়া প্রধানতঃ এই চারি প্রদেশেই সোণা পাওয়া যাইত এবং সমস্ত পৃথিবীর কার্য্য সেই স্বর্ণ দ্বারাই হইত। তখন পৃথিবীতে ৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালিফর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ আবিষ্কারের পর হইতে অতিশয় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর এই মহামূল্য সামগ্রী অতি সামান্য লোকের দ্বারা কালিফর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালিফর্ণিয়াতে কাপ্তেন সাটার এবং মার্সেল নামে দুইটী বন্ধু একটী কল চালাইতেন। জলের স্রোতে সে কল চলিত। একটী খাল খনন করিয়া জল আনিয়া সেই জলের বেগে কল চালান হইত। একদিন মার্সেল সাহেব শুনিলেন যে খালের এক স্থানটা বড় অপ্রশস্ত রহিয়াছে। তিনি লোকজন সঙ্গে করিয়া খাল প্রশস্ত করিতে চলিলেন। সাহেব সেই কাটা মাটিতে যেন কি চক্ চকে জিনিস দেখিতে পাইলেন। সেখানে সোণার মত চক্ চকে একরূপ পাথর পাওয়া যাইত; সাহেব প্রথম মনে করিলেন তাহাই বা হইবে। কিন্তু যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহা নয় এবং মাটি হইতে বাস্তবিকই সোণা উঠিতেছে তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার বন্ধুর নিকটে ছুটিলেন। সাটার সাহেব প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে মার্সেল পাগল হইয়াছে কিন্তু যখন সকল কথা শুনিলেন তখন তাঁহারও প্রত্যয় হইল। দুই জনে ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে গেলেন এবং সমস্ত দিন সোণা কুড়াইতে লাগিলেন। কাহাকেও কিছু বলা হইল না বটে কিন্তু একথা ছাপা রহিল না। একজন নিগ্রো তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া সকলই বুঝিল এবং সেও সোণা কুড়াইতে লাগিল। ক্রমে একথা রাষ্ট্র হইল এবং কয়েকদিনেই চারি দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে লোক সোণার আশায় কালিফর্ণিয়ার দিকে ছুটিল। জিনিসের একগুণ দাম দশ গুণ বাড়িল। কালিফর্ণিয়ার নির্জ্জন স্থান লোকারণ্য হইল। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে প্রথম এই প্রদেশে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে এখান হইতে ১০ কোটী ৮১ লক্ষ ৯৭ সহস্র ৫ শত ৫২ টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে। ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

তারপর অষ্ট্রেলিয়ার কথা। ১৮৫১ খৃঃঅব্দে কালিফর্ণিয়ার এই মহা ব্যাপারের কথা শুনিয়া এখান হইতে এডওয়ার্ড হার্গ্রিবস্ নামে একব্যক্তি সেখানে সোণার লোভে গমন করেন। তিনি গিয়া দেখিলেন যে, যে সকল জমিতে সোণা পাওয়া যাইতেছে তাঁহার দেশেও সেরূপ অনেক জমি আছে। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সোণার তল্লাস করিতে লাগিলেন। দুই মাস অনুসন্ধানের পর তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। তিনি স্বর্ণ আবিষ্কার করিলেন। এই আবিষ্কারের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ৬২৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন এবং যে সমস্ত স্থানে স্বর্ণ উৎপন্ন হইবে সেই সকল স্থানের কমিশনার নিযুক্ত করেন। এক বৎসরের মধ্যে এখান হইতে ইংলণ্ডে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার সোণা রপ্তানি হইয়াছিল।



সোণা তুলিতে প্রায়ই চারিজন লোকের আবশ্যক হয়। ইহার কমে সুবিধা হয় না। তবে অনেক দলে বেশী লোকও থাকে। দুইজনে মাটি খুঁড়িতে থাকে। একজন সেই মাটি একটা চালনের মত যন্ত্রের উপর ফেলে এবং আর এক জন তাহার উপর জল ঢালিতে থাকে। যত মাটি ও বালি জলের সঙ্গে চালিয়া যায় তাহার উপরে সোণার টুকরা থাকে। এই প্রণালীতে অনেক সোণার টুকরাও মাটির সঙ্গে চালিয়া যায়। এজন্য কালিফর্ণিয়া দেশে আর এক রূপ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। পারদপূর্ণ এক পাত্রের ভিতর দিয়া মাটি চালিয়া দেওয়া হয়; সোণার টুকরা গুলি পারদের আকর্ষণে লাগিয়া থাকে এবং মাটি সরিয়া যায়। অবশেষে আগুনের উত্তাপে পারা হইতে সোণা পৃথক করিয়া লওয়া হয়। কেবল যে সোণার টুকরা পাওয়া যায় তাহা নয়। মাঝে মাঝে বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডও পাওয়া গিয়া থাকে। মাটির অধিক নীচে আকরে যে সমুদয় সোণা পাওয়া যায় তাহা তুলিতে অধিক কষ্ট ও পরিশ্রম হয়। পাথুরে কয়লা প্রভৃতি যেরূপে তোলা হয় ইহাও সেইরূপে তুলিতে হয়। আকরের স্বর্ণ প্রায়ই একরূপ প্রস্তরের খনিতে পাওয়া যায়।

সোণা কি কি ব্যবহারে লাগে তাহা বোধ হয় সকলেই জান। আমাদের দেশে যেমন রূপার টাকা প্রচলিত, ইউরোপের অনেক দেশে তাহা নহে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত। তার পর অলঙ্কার ও অন্যান্য নানারূপ বিলাস-দ্রব্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজাদের সোণার সিংহাসন ছিল এ কথা অনেকেই শুনিয়াছ। এখন পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬৩০ কোটী টাকার সোণার আমদানি রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ২০ কোটী টাকার সোণার অলঙ্কার ও অন্যান্য বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সোণা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া রূপার দর কমিতেছে। পূর্ব্বে বিলাতের পাউণ্ডের দাম আমাদের ১০৲ টাকা ছিল এখন ১৩৲ টাকারও উপর উঠিয়াছে। এইরূপ ভাবে

কিছু দিন চলিলে এ দেশের যে কি গতি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। বিলাতে আমাদের যে টাকা পাঠাইতে হয় তাহা পাউণ্ডের হিসাবে দিতে হয় সুতরাং আমাদেরই লোকসান। এই জন্য এখন বইর দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আজ কাল এই প্রশ্ন লইয়া এদেশের এবং বিলাতের সংবাদ পত্রে ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। মীমাংসা এখনও কিছুই হয় নাই।

নব বর্ষ।

১

দেখিতে দেখিতে হায়!
বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ পড়িয়ে থাকে কতই কামনা
হৃদে উঠে দীর্ঘ শ্বাস "কিছুই হলোনা।"

২

স্মরি যবে গত কথা
বড়ই ব্যাথিত প্রাণ;
আত্মগ্লানি অনুতাপে
হৃদয় মলিন ম্লান।
কে যেন সান্ত্বনা দিতে আসিয়ে তখন
ধীরে ধীরে বলে এই মধুর বচন।

৩

"অতীতের দুঃখ কথা
অনুতাপ ভুলে যাও;
সম্মুখের পথ পানে
ফিরে চাও ফিরে চাও;
আশা কর নববর্ষ আসিছে আবার।
নূতন উৎসাহে কার্য্য সাধ আপনার।

৪

"দেখ নাকি স্রোতস্বতী
উৎসাহে নূতন জলে
পূর্ণ হয়ে বরষায়
কেমন আনন্দে চলে।
সে উদ্যমে বাধা দেয়
হেন সাধ্য আছে কার?
আশা কর নববর্ষ
আসিতেছে পুনর্ব্বার।

৫

"দেখ নাকি বৃক্ষগুলি
বসন্তের আগমনে
নব পত্রে শোভা পায়
কেমন আনন্দ মনে!
উৎসাহে পবন ভরে
দোলে ফুল দোলে পাতা
তারা কি তখন কাঁদে
স্মরিয়ে পূর্ব্বের কথা?
তবে কেন বৃথা দুঃখ ক্রন্দন অসার?
আশা কর নববর্ষ আসিছে আবার।

৬

"প্রকৃতি-নিয়ম দেখি
শিখ এই সার কথা;—
অনর্থক দুঃখ করি
দিন না কাটায়ো বৃথা।
সম্মুখে রয়েছে যাহা
তারি কর ব্যবহার;
ঈশ্বরে স্মরণ করি
সাধ কার্য্য আপনার।"

সাঁওতাল জাতির বিবরণ।

সখার পাঠক পাঠিকা। সাঁওতালের নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ, ধাঙ্গড়, পাহাড়ী এবং কোলদিগের মত ইহারাও ভারতের আদিম অধিবাসী। বাঙ্গালার পশ্চিম সীমাতে যে সকল জঙ্গল এবং পাহাড় আছে সাঁওতালেরা সেই সকল জঙ্গল এবং পাহাড়ে বাস করে। ঐ সকল জঙ্গল এবং পাহাড় পালামৌ, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, মানভূম প্রভৃতি জেলা এবং মহলমার অন্তর্গত। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালা এবং বেহারের মধ্যে রাজমহল পাহাড়ের নিকটে যে সকল সমতল স্থান আছে তাহাতে এত সাঁওতালের বাস যে, ঐ সকল স্থানের নাম "সাঁওতাল পরগণা" হইয়াছে।

সাঁওতাল দেখিতে যদিও অনেক পরিমাণে ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের মত কিন্তু ঐ সকল জাতি অপেক্ষা যে ইহারা বেশী বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মিষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায়ই কাহারো গোঁপ দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমরা মনে করিও না যে, ইহারা গোঁপ দাড়ি কামাইয়া ফেলে, ইহাদের গোঁপ দাড়ি উঠেই না। সাঁওতালেরা খুব শিকারী, এবং কৃষিকার্য্যেও বেশ দক্ষ। আত্ম নির্ভরের ভাব ইহাদিগের প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং আলস্য কাহাকে বলে একেবারেই জানে না। এই সকল কারণে সাঁওতালদিগের মধ্যে এমন পরিবার কিম্বা ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না যাহারা আহার অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অবশ্য তাহাদিগের দোতালা বাড়ী নাই, ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল জামা নাই, বিলাসের জিনিশ কিছুই নাই, কিন্তু তাহাদিগের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই আছে। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত যতই পড়িবে, তাহাদিগের বিষয় যত সমালোচনা করিবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, ঐ সকল জাতির অনেকের অপেক্ষা সাঁওতালদিগের অবস্থা বেশী উন্নত। কৃষি বিষয়ে নিপুণতা, ধৈর্য্য, এবং শ্রমদক্ষতা তাহাদিগের এই উন্নতির কারণ। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের জাতীয় প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সাঁওতালেরা অধিক দিন একস্থানে বাস করিত না। চাষ বাসের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কখন এস্থান কখন অন্য স্থান করিয়া বেড়াইত। সাঁওতালেরা যেখানে যায় সে স্থান হাজার জঙ্গল হইলেও তাহা পরিষ্কার এবং কৃষির উপযুক্ত করিয়া লয়। আপন পরিবারের ভরণপোষণের নিমিত্ত যতই কেন পরিশ্রম করিতে হউক না, সাঁওতালেরা তাহা প্রফুল্ল চিত্তে স্বীকার করে। প্রাণান্তেও অপরের দাসত্ব স্বীকার করে না। সাঁওতালদিগের এই সকল স্বাভাবিক সদ্‌গুণের সঙ্গে যদি শিক্ষা থাকিত তাহা হইলে মণি কাঞ্চনের যোগ হইত।

আজ কাল কিন্তু ইউরোপীয় মিশনরিদিগের প্রসাদে অনেক স্থানে সাঁওতালেরা সুন্দর শিক্ষা পাইতেছে। পাঠক পাঠিকা! তোমরা সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সকল সৎশিক্ষা পাইতেছ, সাঁওতালেরা তাহা পায় নাই। যদিও তাহাদিগের চরিত্রে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রাচ

তাহাদিগের মধ্যে এমন সকল সদ্‌গুণ আছে যাহা তোমাদিগের অনুকরণীয়। যদি যথার্থ মনুষত্ব লাভ করিতে চাও তাহা হইলে তোমরাও সাঁওতালদিগের মত শ্রমদক্ষ এবং ধৈর্য্যশীল হও, এবং আত্ম নির্ভর শিক্ষা কর।

অন্য অন্য আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় সাঁওতালদিগের পরিচ্ছদ অতি সামান্য, সচরাচর প্রায় একখানি কৌপিন মাত্র, কিন্তু স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অনেকটা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মাহলাদিগের মত। কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই অলঙ্কার ভাল বাসে, এবং নানাপ্রকার পুষ্প এবং পাখীর পালক সংগ্রহ করিয়া আপন আপন শিল্প নিপুণতা অনুসারে নানা সুদৃশ্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা পিত্তল, কাঁসা নির্ম্মিত অলঙ্কারও ব্যবহার করে।

জনার, ভুট্টা, হাঁস, কুক্কুট, মাংস ইত্যাদি ইহাদিগের প্রধান খাদ্য, আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তবে কেহ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদিগের সহিত পূর্ব্বকালের শত্রুতাবশতঃ তাহাদিগের ছোঁয়া কোন দ্রব্য আহার করে না। আমরা কিন্তু যে সকল সাঁওতালের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি তাহারা এ কথা অস্বীকার করে।

সাঁওতালদিগের কুটীরগুলি সুনির্ম্মিত এবং পরিষ্কার, অনেকে আবার দেয়ালে নানারঙের নানাপ্রকার ছবি এবং লতা পাতা আঁকিয়া রাখে। প্রতি সাঁওতাল পল্লির ঘরগুলি একটী প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে সন্নিবেশিত। প্রত্যেক বাড়ীতেই গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের থাকিবার স্থান আছে। অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন সাঁওতালেরা প্রায় সকলেই মহিষ পুষিয়া থাকে, এবং দধি দুগ্ধের ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়, সামান্য বাঁশের এমন সুন্দর সুন্দর বাঁশী প্রস্তুত করে যাহার সুস্বরে এমন হৃদয় নাই যে মুগ্ধ হয় না। ধাঙ্গড এবং কোলদিগের মত প্রত্যেক সাঁওতাল পল্লিতেও এক একটী নৃত্য গীতের আড্ডা আছে; যেখানে গ্রামের বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকল একত্রিত হইয়া নৃত্য গীত করে। সাঁওতালদিগের বিবাহ প্রণালী ধাঙ্গড এবং কোলদিগের ন্যায়। বহু বিবাহ যদিও প্রচলিত আছে কিন্তু এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে প্রায়ই কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না।

সাঁওতালদিগের প্রধান দেবতার নাম "সিঙ্গ বঙ্গা।" কোলদিগের ন্যায় ইহাদেরও বিশ্বাস এই যে, ঐ দেবতা সূর্য্যেতেই স্বপ্রকাশ, ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি উপদেবতা আছে। স্ত্রীলোকেরা হাতীকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে, এবং হাতী দেখিলে তাহার সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে। হিন্দুদিগের ন্যায় সাঁওতালেরাও শব দাহ করে; এবং দগ্ধ অস্থি নদীতে কিম্বা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। সাঁওতালদিগের বিষয় যাহা বলা হইল তাহা অতি সামান্য, অন্য সময়ে ইহাদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত বলা যাইবে।

পরিশ্রমের ফল।

(বালকের রচনা।)

এক ধনি কৃষকের এক বৎসরের ছোট বড় দুইটি পুত্র ছিল। যে দিন তাহার দ্বিতীয় পুত্র জন্মিল, সেই দিন কৃষক আপনার বাগানে সমান চাষ ও পাইট করিয়া ২টি আমের গাছ রোপণ করিল। এই দুইটী গাছ এমন সমান রূপে বাড়িয়া উঠিল যে, কোন ব্যক্তি তাহাদের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিত না। পরে ঐ দুই সন্তান কার্য্য কর্ম্মের উপযুক্ত হইলে, কৃষক বসন্ত কালের কোন দিনে আপন সন্তানদ্বয়কে ডাকিয়া বাগানে গিয়া কহিল, "আমি এই দুই উত্তম বৃক্ষ তোমাদিগকে দিবার জন্য এক কালে রোপণ করিয়াছিলাম, এখন তাহা লও, ইহা তোমাদিগের শ্রমানুসারে ফল দিবে, আলস্য করিলে ফল দিবে না।"

পরে কনিষ্ঠ অতিশয় শ্রম ও মনযোগ করিয়া বৃক্ষের অনিষ্টকারক কীট সকল দূর করিয়া বৃক্ষটীকে পরিষ্কার রাখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত গাছের চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া যাহাতে রৌদ্র ও শিশির দ্বারা তাহার মূল প্রতিপালিত হয় এমত চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপন বৃক্ষের যত্ন না করিয়া পথিক ও শ্রান্ত লোকদিগকে ইষ্টক ফেলিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দিয়া কালক্ষেপ করিত। সর্ব্বদা লোক কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে অপমানিত হইয়া ক্রন্দন করিত, এবং বৃক্ষের কার্য্যে এত আলস্য করিত যে তাহাকে কখনও এ কার্য্যে মন দিতে দেখা যায় নাই।

পরে বর্ষাকালে এক দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেখিল কনিষ্ঠের বৃক্ষ উত্তম ফলভরে পূর্ণ হইয়াছে; দেখিবা মাত্র অতি শীঘ্র আপন বৃক্ষের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া মনে করিল যে, তাহার বৃক্ষেও ঐ মত ফল ধরেছে, কিন্তু তাহাতে ফল না দেখিয়া চমৎকৃত হইল, দেখিল তাহার গাছ ঘাস ও লতাতে বেষ্টিত ও আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে রাগ ও ঈর্ষাতে পূর্ণ হইয়া আপন পিতার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, "হে পিতঃ, আপনি আমাকে কিরূপ গাছ দিয়াছেন? আমার বৃক্ষ ঝাঁটার ন্যায় শুষ্ক, ও আমি তাহাতে একটাও ফল পাইলাম না, কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনি উত্তম বৃক্ষ দিয়াছেন; অতএব আপনি কনিষ্ঠকে আজ্ঞা করুন যে, সে তাহার ফলের অংশ আমাকে দেয়।" বৃদ্ধ কৃষক কহিল, "শ্রমী যদি অলস ব্যক্তিকে পালন করিতে শ্রম করে, তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হয়। তুমি আপন ভাগ্যে সন্তুষ্ট হও। ইহা তোমার আলস্যের ফল। তোমার ভ্রাতার বৃক্ষের ফল দেখিয়া আমাকে পক্ষপাতী ভাবিও না, কেন না তোমার ও তাহার বৃক্ষ সমান ছিল, কিন্তু তুমি নিজ গাছের পরিপাট্য না করাতেই এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। এখন তোমার গাছ তোমাকে না দিয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বাগানে যাইয়া অতি সুন্দর আর একটা চারা লও, ও তাহার প্রতিপালন করিয়া আপন দোষ নিবারণ কর; এবং তাহাতেও যদি তুমি আলস্য কর, তবে তাহাও তোমার ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে।" জ্যেষ্ঠ আপন পিতার মনোবাঞ্ছা জ্ঞাত হইয়া উদ্যানে গিয়া অতি সতেজ একটী চারা পছন্দ করিয়া লইল। কনিষ্ঠের সৎপরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা জ্যেষ্ঠও আপন বৃক্ষেতে মনোযোগ করিতে লাগিল; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সৎপরামর্শ গ্রহণ

করিয়া নিজ মন্দ আচরণ ত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিরালস্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

বর্ষাকালে বাগানে গিয়া এই পরিশ্রমের ফল স্বরূপ আপন গাছে অনেক ফল দেখিয়া আমোদিত হইল। তাহার পিতা পুত্রের স্বভাব পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইয়া পর বৎসরে বাগানের তাবৎ ফল সমান বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন।



সাজি।

একটি ইংরাজ মহিলার ৯০ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যু হয়। তাঁহার উইলে এই লেখা ছিল,—"ডাক্তার গ্রেভির চিকিৎসা ও যত্নে এবং তাঁহার বহুমূল্য উপদেশে আমি এত দিন বাঁচিয়া ছিলাম, পুরস্কার স্বরূপ আমি আমার বড় মেহগ্নীর বাক্সে যাহা আছে সেই সমস্তই তাঁহাকে দিলাম।" ইংরাজ মহিলার আত্মীয়েরা ইহাতে বড়ই বিরক্ত ও দুঃখিত হইল। ডাক্তার গ্রেভী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—ভারি খুসী। নিজ অদৃষ্টকে যেন মনে কতই প্রশংসা করিতেছেন। চাবি লইয়া বাক্স খোলা হইল। বাক্স খুলিয়া দেখা গেল, কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডাক্তার গ্রেভী সেই মহিলাকে যে সমস্ত ঔষধ দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঔষধে বাক্সটী পূর্ণ; তাহা খোলাও হয় নাই। গ্রেভী বিষন্ন হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

* * *

আর একজন মহিলা ডাক্তারের সহিত দেখা হইলে, একটা না একটা অসুখের কথা বলিতেন। ঘাটে পথে যেখানে দেখা হইত, সেই খানেই ডাক্তারকে ধরিয়া একটা অসুখের কথা বলিতেন। ডাক্তারকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। একদিন একটা চৌমাথা রাস্তায় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র, মহিলাটী কিছু না বলিতেই ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! আপনাকে আজ বড়ই দুর্ব্বল দেখিতেছি। চক্ষু বুজিয়া একবার জিহ্বাটা বাহির করিয়া দেখান ত?" মহিলাটী সেই প্রকার করিবামাত্র, ডাক্তার তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি কোথাও যাইতেছিলেন। মহিলাটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু মুদিত করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া সেই চৌমাথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, ডাক্তার নাই, কিন্তু রাস্তার লোক, হো হো করিয়া হাসিতেছে।

* * *

দুজন ইংরেজ সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছে। রাত্রিতে মশার উপদ্রবে আর ঘুম হইতেছে না; মশারি ছিল না, সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া মশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। তখন গ্রীষ্মকাল, কতক্ষণ কম্বলের মধ্যে থাকিবে? একজন একটু মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, একটা পোকা ঘরের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহার গায়ে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া তার সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিল,—"ওরে ভাই আমাদের আজ নিস্তার নাই, আমরা

ঘরের আলো নিবাইয়া কম্বলের মধ্যে লুকাইয়া আছি বলিয়া, ঐ দেখ বেটীরা লণ্ঠন লইয়া আমাদের অনুসন্ধান করিতেছে।" ঘরে একটা সোনাকী পোকা উড়িতেছিল।

* * *

কলিকাতার রাস্তায় সন্ধ্যার পর "গরম গরম চা" বিক্রয় হইয়া থাকে। একজন চাওয়ালা চা বিক্রী করিয়া ফিরিতেছে, এমন সময় একজন পাহারাওয়ালা দেখিয়া, বলিল "পাহারাওয়ালা সাহেব, এক পেয়ালা চা পি জিয়ে।" পাহারাওয়ালা সাহেবকে একটু খুসী করে এই তার ইচ্ছা। পাহারাওয়ালা সাহেব বলিলেন না—চা খেলে শরীর বড় গরম হয়, একটুও ঘুম হয় না।

* * *

রমেশের বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ। অঙ্কে তাহার ভারি বিদ্যা। তিনি কোন পুস্তকে পড়িয়াছিলেন যে, একটা ডিম সিদ্ধ হইতে তিন মিনিট লাগে। বাড়ীতে ডিম রান্না হইবে শুনিয়া রমেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ১৫টা ডিম আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ত্রৈরাশিক কসিয়া বলিয়া দিলেন, ৪৫ মিনিট ধরিয়া ডিম সিদ্ধ করিবে। ঘড়ী খুলিয়া রাখিলেন, ডিম সিদ্ধ হইতে লাগিল।

* * *

কলিকাতার টাউনহলে খুব বড় সভা হইতেছে। একতিল স্থান নাই, লোকে লোকারণ্য। আর এতই গোলযোগ হইতেছে যে, কোন কাজই হইতে পারিতেছে না। আর উপায় না দেখিয়া, তখন একজন খুব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এখন দান সংগ্রহ হইবে।" বলিবামাত্র দেখা গেল হল শূন্য প্রায়।

* * *

এক সভায় দরিদ্রদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছিল। যিনি অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন, তিনি অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে, একজন ধনীর নিকট উপস্থিত হইয়া, বড় আশা করিয়া তাঁহার সম্মুখে টাকার থালা খানি ধরিলেন। ঐ ব্যক্তি বড় কৃপণ ছিলেন, বলিলেন "মহাশয় আমার অবস্থা স্বচ্ছল নহে।" অর্থ সংগ্রাহক বলিলেন, "তবে আপনি ইহা হইতে কিছু গ্রহণ করুন, কারণ আপনাদের মত লোকের জন্যই অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।"

* * *

রামসুন্দর একেবারেই কালা। কিন্তু তার ইচ্ছা যে কেহ তাহাকে কালা বলিয়া বুঝিতে না পারে, এই জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। একদিন সে একদিক দিয়া যাইতেছে, আর একদিকে হরগোবিন্দ নামে তার একজন পরিচিত লোক যাইতেছে। হরগোবিন্দের সঙ্গে আর একটা লোক রহিয়াছে, হরগোবিন্দ বড় কৌতুকী। সে সঙ্গের লোকটাকে বলিল, "একটা মজা দেখিবে?" এই বলিয়া রামসুন্দরের দিকে তাকাইয়া খুব হাত এবং মুখ নাড়িতে লাগিল, যেন কত চীৎকার করিয়াই সে রামসুন্দরকে ডাকিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু সে হাত এবং মুখই নাড়িতেছে, একটুও শব্দ করে নাই। রামসুন্দর তাড়াতাড়ি রাস্তার অপর দিকে যাইয়া বলিল "এত চীৎকার করিতেছিলে কেন, আমি কি শুনিতে পাই না?"





ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮।

নাগা জাতি।

সাঁওতাল, কোল, ধাঙ্গড, পাহাড়ী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় আদিম অধিবাসী যেমন বাঙ্গালার পশ্চিম সীমাস্থিত জঙ্গল ও পাহাড়ে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য স্থানে বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ নাগা, গারো, সিতেঙ্গ, মিকির, কাছাড়ী, কুকী, সিঙ্গফো এবং কাম্‌তী প্রভৃতি অন্য কতকগুলি জাতি ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্ব সীমায় এবং আসামের পাহাড়ে ও জঙ্গলে বাস করে। *এই সকল জাতির মধ্যে নাগারাই প্রধান* অর্থাৎ ইহারা বল এবং বিক্রমের নিমিত্ত যেমন প্রসিদ্ধ তেমনি ইহাদিগের সংখ্যা এবং দেশের আয়তন ও অপেক্ষাকৃত বেশী। এই নাগাদিগের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে, কিন্তু ইহাদিগের বিষয় জানিতে হইলে ইহাদিগের দেশটা যে কোথায় প্রথমে জানা আবশ্যক; ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্ব সীমার কোন পাহাড়ে ইহারা বাস করে কেবল এই মাত্র জানিলে যথেষ্ট হইল না, কারণ নাগাদিগের মত আরও অনেক জাতীয় আদিম অধিবাসী ঐ সকল স্থানে বাস করিয়া থাকে।

তোমরা সকলেই ভূগোল বিবরণ, ভূগোলসূত্র, কিম্বা ঐরূপ আর কোন পুস্তক পাঠ করিয়া থাক, এবং হয়ত কেহ কেহ বুঝিতে পার না যে, কতকগুলি দেশ, নদী, পাহাড় এবং হ্রদের নাম মুখস্থ করার কি উপকারীতা? বাস্তবিক কতকগুলি নাম মুখস্থ করা ভূগোল পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। তোমরা যত শিক্ষা পাইবে ততই দেখিবে যে, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতির জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভূগোল কত প্রয়োজনীয়, এইত হাতে হাতে দেখিতে পাইতেছ নাগা দেশ কোথায় তোমাদিগের জানিবার আবশ্যক হইয়াছে কিন্তু তোমরা যদি ভূগোল বিবরণ কিম্বা ভূগোলসূত্র না পাঠ করিতে, আসাম কোথায়, ব্রহ্মপুত্র নদ কোথায় না জানিতে তাহা হইলে নাগা দেশ যে ভারতবর্ষের কোন্ দিকে এবং কোন্ স্থানে তাহা আদপে বুঝিতেই পারিতে পারিতে না। এখন দেখা যাক নাগা দেশটা কোথায়। ভারতবর্ষের মানচিত্র (Map) খানি হাতে করে আসামের দিকে একবার চেয়ে দেখ, অনেকগুলি পাহাড় দেখিতে পাইবে, এই পাহাড়গুলি সব এক সমান নয়, কতকগুলি ছোট ছোট, আবার কতকগুলি খুব উঁচু। এই সকল পাহাড়ের মধ্যে যে গুলিতে নাগারা বাস করে সেইগুলির নাম "নাগা পাহাড়" (*Naga Hills*) বা "নাগাদেশ"। নাগাদেশ দীর্ঘে এবং প্রস্থে অনেক দূর

বিস্তৃত, ইহার উত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্র নদ, শিবসাগর, নবগ্রাম (নওগাঁ) এবং লক্ষীপুর (লখিমপুর), পশ্চিমে কৌপিল নদী, পূর্ব্বে সিঙ্গফো, কাম্‌তী এবং মণিপুর পাহাড়, নাগা দেশ দক্ষিণে যে কতদূর পর্য্যন্ত তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন উহা দক্ষিণে নামতনাই নদীর উত্তর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই জাতিকে কেন "নাগা" বলে এই বিষয়ে অনেক মত ভেদ আছে, সচরাচর লোকের এই বিশ্বাস যে "ন্যাঙ্গটা" অর্থাৎ উলঙ্গ কথা হইতে "নাগা" হইয়াছে, কিন্তু নাগারাত একবারে উলঙ্গ নয়, কাযেই এ কথা খাটে না। কেহ কেহ বলেন "নাগা" অর্থাৎ সর্প হইতে "নাগা" নামের উৎপত্তি, আবার অনেকের মত যে কাছাড়ী "নাগা" শব্দ হইতে এই জাতির নাম নাগা হইয়াছে, কারণ কাছাড়ী ভাষায় "নাগা" শব্দের অর্থ যুবাপুরুষ, যুবাপুরুষের প্রধান কাজ যুদ্ধ করা। যাক এ বিষয় লইয়া আমাদের এখন মাথা ঘুরাইবার আবশ্যক নাই। অপরে যে যাহাই বলুক না কেন নাগারা কিন্তু আপন জাতীয় নামের বড় একটা ধার ধারে না, সমগ্র জাতির যে একটা সাধারণ নাম থাকে এ ধারণাই তাহাদিগের নাই, তাহারা যে পল্লিতে বাস করে সে সেই পল্লির লোক বলিয়া পরিচিত, অর্থাৎ "কোহিমা" নামক পল্লিতে যাহাদিগের বাস তাহারা কোহিমার লোক বলিয়া আপনাদিগকে জানে, এইরূপ মেজুমা, থনোমা, যতসোমা প্রভৃতি পল্লির নাগারা আপনাদিগকে ঐ সকল পল্লির লোক বলিয়া পরিচয় দেয়।

বিবাদ ও যুদ্ধ নাগাদিগের মধ্যে প্রায় আছেই, কখন কোহিমা পল্লির নাগাদের সঙ্গে যত্‌সোমা পল্লির যুদ্ধ, কখন বা থনোমার সঙ্গে মেজুমার যুদ্ধ এইরূপ প্রায় চলিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে যে জাতীয় ভাব নাই তাহার কারণ বোধ হয় এই যুদ্ধ বিবাদ, শত্রুতা যেখানে সেখানে একতা কোথা হইতে আসিবে, নাগাদিগকেই বা কি দোষ দিব; তাহারা ত অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতি, কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয় বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহারা নিয়ত পড়িয়া আছে, শিক্ষা এবং সভ্যতার আলোক কখন দেখে নাই, ধর্ম্ম এবং নীতি-চর্চ্চা কখন করে নাই, আর আমরা কি? সভ্য সভ্য বলিয়া যে এত গৌরব করি, বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা পাইয়া সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত পাঠ করি, আমাদের ধর্ম্ম আমাদের নীতি আমাদের কত কি বলিয়া যে এত অহঙ্কার করি, কৈ, আমাদিগের মধ্যেই বা জাতীয় ভাব কোথায়? এইত বাঙ্গালি উৎকল বাসীকে ঘৃণা করিতেছেন, বিহারী বাঙ্গালিকে ঘৃণা করিতেছেন, আবার এদিকে বাঙ্গালিতে বাঙ্গালিতে, বেহারীতে বেহারীতে ও মিল নাই; বক্তৃতায় ভাই ভাই শুনিতেছি, অথচ ব্যবহারে লাঠালাঠি করিতেছি। ধিক্ আমাদের সভ্যতা! ধিক্ আমাদের শিক্ষা!! সখার পাঠক পাঠিকা! ভরসা করি তোমাদিগের হইতে এ লজ্জা নিবারণ হইবে, ভগবানের কৃপায় তোমরা যে সুশিক্ষা পাইতেছ তাহার গুণে তোমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, এবং যে ভাবের অভাবে আমাদিগের মধ্যে একতা নাই সেই ভ্রাতৃ ভাব শিক্ষা করিবে।

সমগ্র নাগা জাতি দশ কি বার সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের যেমন অনেক বিষয়ে মিল আছে তেমনি আবার অনেক বিষয়ে বিভিন্নতাও আছে, এমন কি ভাষা পর্য্যন্তও পৃথক। যে সকল নাগারা পাহাড়ের উঁচু

উঁচু ভাগে বাস করে তাহারা প্রায়ই ফর্সা এবং সুশ্রী, কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচে বাস করে



তাহারা তত সুপুরুষ নয়, বর্ণও ময়লা, দেখিতেও কদাকার। নাগাদিগের মধ্যে যেমন আকারগত বিভিন্নতা দেখা যায় চরিত্রেও তাই, কোন সম্প্রদায় বেশ ধীর প্রকৃতি এবং সামাজিক, আবার কোন কোন সম্প্রদায় ঠিক ইহার বিপরীত। সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার এবং চরিত্র বর্ণনা করিতে গেলে অনেক হইয়া পড়ে, অতএব এই প্রবন্ধে কেবল আঙ্গামি নাগাদিগের বৃত্তান্তই বলা হইবে।

নাগারা যেমন নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য পাহাড়-বাসী জঙ্গলী জাতি অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, নাগাদিগের মধ্যে আবার আঙ্গামি নাগারা অপর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আঙ্গামিদিগের মধ্যে রীতিমত শাসন প্রণালী নাই। শাসন প্রণালী কাহাকে বলে তোমরা বোধ হয় সকলেই জান। আজ কাল খবরের কাগজে, পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নীর মুখে দিনের মধ্যে হয়ত দু দশবার "ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট" "বৃটীস গবর্ণমেণ্ট" শুনিতে পাও, এই কথাটার মানে ইংরাজদিগের শাসন প্রণালী। "শাসন প্রণালী" কথাটা বেশ সহজ, কিন্তু ইহার ভাবটা একটু কঠিন, অনেকে বোধ করি এখনও মনে ধারণা করিতে পার নি। এই দেখ, তোমরা প্রত্যহ বিদ্যালয় যাও, সেখানকার নিয়মগুলি একবার ভেবে দেখ দেখি; বেলা দশটা কিম্বা সাড়ে দশটার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইতে হয়, যে, যে শ্রেণীতে পাঠ কর তাহাকে সেই শ্রেণীতে গিয়া বসিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট পাঠগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট বলিতে হয়, ক্লাসে বসিয়া গোলমাল করিবার যোটি নাই, ছুটীর সময় উপস্থিত না হইলে বাড়ী আসিবার যো নাই, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেতন দেওয়া চাই, এইরূপ আরও কত প্রকার নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়, এবং এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে দণ্ড পাইতে হয়। ক্লাসে বসিয়া গোলমাল করিলে, কিম্বা পড়া বলিতে না পারিলে যে কি হয় তাহা আর তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। একেই বলে বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালী। আপন আপন বাড়ী এবং পরিবারের কায কর্ম্ম বেশ মনোযোগ করিয়া দেখ সেখানেও কতকগুলি নিয়ম দেখিতে পাইবে, দেখিবে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই এমন এক ব্যক্তি আছেন যাঁহার কথা সকলেই মান্য করে এবং যাঁহার আজ্ঞা অনুসারে বাড়ীর সমস্ত কায কর্ম্ম হয়, এদিকে অন্য অন্য কায কর্ম্মের ভার, পরিবারের অন্য অন্য ব্যক্তির উপর, কাহার রান্নার ভার, কাহার উপর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের স্নান আহারের ভার। সমস্ত কাজ কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, দ্রব্যাদি রাখিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যে পরিবারের প্রত্যেকে এই সকল নিয়ম যত রক্ষা করিয়া চলেন সেই পরিবারে তত শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিদ্যমান, ইহারি নাম পারিবারীক শাসন-প্রণালী। বিদ্যালয় এবং বাড়ীতে যেমন কতকগুলি বাঁধা-বাঁধি নিয়ম না থাকিলে সুন্দররূপে কায চলে না সেইরূপ দেশের মধ্যে যদি কোন প্রকার শাসন

প্রণালী না থাকে এবং সেই শাসন-প্রণালীর নিয়ম সকল যদি জন সাধারণ প্রতিপালন না করে তাহা হইলে মহা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। তোমার কোন সমপাঠী যদি তোমার উপর কিছু অত্যাচার করে, তোমার হয়ত এক খানি বই ছিঁড়িয়া দেয় কিম্বা তোমাকে একটী কিল মারে তাহা হইলে তুমি যেমন শিক্ষক মহাশয়ের নিকট নালিশ কর, বাড়ীতে তুমি যদি কোনরূপ মন্দ ব্যবহার কর তাহা হইলে পিতা মাতা যেমন তিরস্কার করেন, কিম্বা অপরাধ গুরুতর হইলে দণ্ড দেন, সেইরূপ দেশের মধ্যেও এক জন অপরের প্রতি অত্যাচার করিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দেশের শান্তি ভঙ্গ করিলে বিচারালয়ে অপরাধীকে দণ্ড পাইতে হয়। জজ, মাজীষ্ট্রেট, পুলিষ ইত্যাদির নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, দেশের মধ্যে যাহাতে কোন অশান্তি কিম্বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে তাহার সুবন্দোবস্ত করা এবং ঘটিলে বিচার করিয়া অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া ইহাঁদিগের কার্য্য। যে নিয়ম সমূহ দ্বারা এই সকল কায সুন্দররূপ চলিতেছে তাহাকেই এই দেশের শাসন প্রণালী বলে।

যে সকল সুবন্দোবস্তের গুণে দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা হইতেছে, অপরাধী দণ্ড পাইতেছে এবং নিরুৎপাতে এবং নির্ব্বিঘ্নে সকলে আপন আপন কায করিতেছে, এ সুবন্দোবস্ত যদি না থাকে তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি দেশের অবস্থা কি হয়? নাগা জাতির মধ্যে এই সুবন্দোবস্ত নাই এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, দেশের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি প্রায় লাগিয়াই আছে। "যোর যার মুলুক তাহার" এই তাহাদের আইন, সকলে আপন আপন স্বাধীন ইচ্ছার বশীভূত হইয়া চলে, কেহ কোন নিয়মের বাধ্য নয়। একেত নাগাদিগের প্রকৃতি অতিশয় উগ্র তাহাতে আবার দেশের মধ্যে কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত নাই, এরূপ অবস্থায় যে এক দিনও চলে এই আশ্চর্য্য, কিন্তু বাস্তবিক তাই চলিতেছে। নাগাদিগের মধ্যে জজ, মাজিষ্ট্রেট নাই, পুলিষ নাই, কিম্বা বিচারালয় নাই, আর এ সকলের আবশ্যক ও তাহাদের হয় না, কারণ তাহাদিগের মধ্যে অতি সামান্য সামান্য কারণে যেরূপ ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত হয় তেমনি আবার সামান্যতেই মিটিয়া যায়, যদিও কখন কখন (এই সকল) সামান্য কারণ হইতেই কাটা কাটি যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। আপসে ঝগড়া বিবাদ মিটাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামেই কতকগুলি প্রধান প্রধান লোক দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ব্যক্তির প্রধানত্বের কারণ ইহাদিগের রণ-দক্ষতা, দৌত্য কার্য্যে নিপুণতা, বক্তৃতা শক্তি এবং সম্পত্তি। অবশ্য নাগাদিগের মধ্যে "সম্পত্তি" বলিলে যাহা বুঝায় সেই সম্পত্তি, অর্থাৎ গরু, বাছুর, মেষ, মহিষ, ইত্যাদি এবং চাষের উপযুক্ত কিছু জমি। সামান্য সামান্য বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহাঁরা মিটাইয়া দেন সত্য, আর নামেও এই সকল ব্যক্তিই গ্রামের মধ্যে প্রধান কিন্তু ইহাঁদিগের ক্ষমতাই কেবল নাম মাত্র; কারণ জন সাধারণ তাঁহাদিগের ইচ্ছা বা আজ্ঞা অনুসারে চলিতে বাধ্য নয়, কোন বিষয়ে জন সাধারণের মতের সহিত যদি প্রধানদিগের অনৈক্য হয় তাহা হইলে সেই অবধি তাঁহাদিগের প্রধানত্ব ঘুচিয়া যায়।

সকল বিষয়ে সকল সময়েই যে গ্রামের সমস্ত লোক এক মত হয় তাহা নয় আর মত ভেদ উপস্থিত হইলে অধিক সংখ্যক লোকের মত যাহা হয় স্বতন্ত্র মতাবলম্বীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও অপর দলের সহিত যোগ দেয় না, আপনাদিগের মত অনুসারে কার্য্য করে। এই কারণ বশতঃ

নাগাদিগের জাতীয় বিবাদে এরূপ ঘটনা প্রায়ই বিরল যে এক গ্রামের সমস্ত লোক অপর কোন গ্রামের সমস্ত লোকের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বরং সচরাচর এরূপ দেখা যায় যে, এক গ্রাম কিম্বা পল্লির কতক সম্প্রদায় অন্য গ্রামের কতক লোকের সহিত যুদ্ধ করিতেছে এবং প্রত্যেক গ্রামের অন্য দলভুক্ত লোকেরা নিরপেক্ষ ভাবে উভয় দলের সহিত বেশ মিশিতেছে। এক গ্রামেও অনেক সময়ে দলাদলি এবং যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়; একবার রক্তপাত হইলে আর রক্ষা নাই, হয় হত্যাকারী না হয় তাহার কোন আত্মীয়কে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে, আজ হউক, কাল হউক, আর কুড়ি বৎসর পরেই হউক হত্যাকারীর মৃত্যু নিশ্চয়। আঙ্গামি নাগারা দেখিতে বলিষ্ঠ এবং সুগঠন, সাহসী এবং রণদক্ষ; প্রতিহিংসা বৃত্তি



যতই কেন প্রবল হউক না সত্য প্রিয়তা নাগাদিগের, বিশেষতঃ আঙ্গামি নাগাদিগের একটী মহৎ গুণ। অন্যান্য নাগা অপেক্ষা আঙ্গামিরা দীর্ঘকায় এবং বর্ণও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, হাত ও পায়ের মোটা মোটা সুগোল মাংস পেশী গুলি দেখিলেই ইহাদের বল বিক্রম এবং কর্ম্ম পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিহিংসা নাগাদিগের অতি পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত, আমাদিগের দেশে লোকে যেমন মৃত্যু কালে সন্তানগণকে আপন আপন সম্পত্তি, টাকাকড়ি দান করিয়া যায়, নাগারা সেইরূপ মৃত্যু কালে সন্তান এবং আত্মীয়গণকে শত্রুর মাথা কাটিয়া সেই রক্তে স্নান করিতে বলিয়া যায়, এই কারণে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন গ্রামে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে পুরুষ পুরুষানুক্রমে "রক্তযুদ্ধ" চলিয়া আসিতেছে এবং কখন কখন এই রক্তযুদ্ধে সমস্ত গ্রাম উৎসন্নপ্রায় হইয়া থাকে।

আঙ্গামি পুরুষদিগের ন্যায় রমনীগণও দীর্ঘকায় এবং সুশ্রী, নাগা রমনীরা আলস্য কাহাকে বলে জানে না, সংসারের একটা না একটা কায লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, জঙ্গল হইতে রন্ধন কাষ্ঠ বহিয়া আনা, ঝর্ণা কিম্বা নদী হইতে জল আনা, রান্না করা, ইত্যাদি রমনীদিগের প্রধান





কায, ইহা ভিন্ন চাসেব সাহায্য করিতে এবং কখন কখন কাপড় ও বুনিতে হয়। বাবান্তবে নাগাদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় বলা যাইবে।



(প্রাপ্ত)

নীতি ও বিদ্যা।

(কথোপকথন।)

সরলা। সেকি লীলা, কেন তুমি মলিন এমন?
হাসি নাই হাসিমুখে হৃদয় ফাটিছে দুঃখে
আজ বল শুভদিনে, কিসের কাবণ?

বিমলা। চল দিদি ত্বরা করি বিদ্যালয়ে যাই,
জাননা কি প্রিয়বোন পুবস্কার বিতবণ
হবে বলে সুধী জন এসেছে সবাই?

লীলা। জানি বোন্, কাঁদিতেছি তাই,—

সবলা। কি বলিলে প্রিয়লীলা কাঁদিতেছ তাই;—
আজি এই শুভদিনে কোথা বোন ফুল্লমনে
উপযুক্ত পুবস্কার লভিব সবাই,
তা না হযে বৃথা কেন কাঁদিতেছ ভাই?

লীলা। নহি উপযুক্ত আমি পেতে পুবস্কার।

বিমলা। সেকি দিদি তুমি বিনা কেবা পাবে আব?

সবলা। পবীক্ষাতে তোমা হেন পাবেনাই কোনজন
তবু যদি নাহি তুমি পাও পুবস্কাব!
অযোগ্য হয়েও ভাই বিদ্যালয়ে যেতে চাই
কি করি আমরা তবে আশাকরি তার!

লীলা। প্রথম হয়েছি আমি জানি পরীক্ষায়,
কিন্তু বোন্ বল দেখি কে কোথা হয়েছে সুখী
নীতি হীন বিদ্যা ল'য়ে হায় এ ধরায়?
বিদ্যা বুদ্ধি যাই বল থাকে যদি নীতি বল
তবে সেই নীতিবান পায় সুসম্মান;
সুনীতি অন্তরে যার বিরাজিত অনিবার
বিদ্যা বিনা তবুও সে দেবতা সমান!

বিমলা। নীতি হীন কিসে তুমি বোন্‌টী আমার ?
লীলা। জানিতে বাসনা যদি হয়েছে তোমার,
তবে আজ প্রিয়বোন্‌ শুন সবে দিয়া মন
কত যে নিষ্ঠুর আমি পারিবে জানিতে।
সরলা। আমিও শুনিব দিদি বলগো ত্বরিতে।
লীলা। একদিন দ্বিপ্রহরে প্রখর রবির করে
বিদগ্ধ শরীর, দিদি বৃদ্ধা একজন,
চারিটী অন্নের আশে ঘুরি ফিরি আশে পাশে
আমাদের দ্বারে আসি দিল দরশন,
নয়নে ঝরিছে জল লেশ মাত্র নাহি বল
শরীরের ভার রাখি লাঠীর উপর
নিকটে দেখিয়া মোরে অতিশয় ক্ষীণ স্বরে
ডাকিতে লাগিল বৃদ্ধা ক্ষুধায় কাতর।
বিমলা। তার পর কি হইল বলগো ত্বরায় ?
লীলা। কি আর হইবে ভাই নিষ্ঠুরের প্রায়
দূর দূর করি তারে, খেদায়ে দিলাম দূরে
কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা করিল প্রস্থান !
দেখিলে কেমন মোর কঠিন পরান।
তাই শুনি মা আমার ডাকিয়া নিকটে তাঁর
কহিলেন ক্ষুণ্ণ মনে ; "লীলারে আমার
হেরি তোর আচরণ ব্যথিত হয়েছে মন
পাষাণে গঠিত কিরে অন্তর তোমার ?
বিদ্যালয়ে গিয়ে বল কি আর হইবে ফল
নীতি হীন তবে কভু নহে পুরস্কার" !
বিমলা। নীতি হীন এই যদি, কার্য্য তব হয় দিদি
মোর তবে পুরস্কারে কোন অধিকার ?
লীলা। কেন ভাই তুমিও কি আমার মতন ?
অনাথ দরিদ্র জনে দুঃখ দেছ অকারণে
তাদের ক্রন্দন শুনে হেসেছ কখন ?
বিমলা। একবার নহে বোন্‌ শত শত বার,
কত দুঃখী অসহায় ক্ষুধায় কাতর হায়
এসেছিল আশা করে নিকটে আমার ;
ঘৃণা করে দূর করে দিয়াছিগো সবাকারে
তাদের ক্রন্দনে ভাই কাঁদিনি কখন,
তাহা ছাড়া ভাই বোনে দুঃখ দিছি
অকারণে
ভৃত্যগণে শুনায়েছি কঠিন বচন,
সতত অসত্যে মতি মিথ্যা ক'য়ে দিবা রাতি
কষ্ট দিছি গুরুজনে মন্দ ব্যবহারে,
গহনা পাইনি বলে বইগুলো দিছি ফেলে
কিসে মোর অধিকার তবে পুরস্কারে ?
সরলা। কেন মিছামিছি ভাই নির্ব্বোধের প্রায়
সে সকল কথা তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে
কাজে কাজে বৃথাকাল কাটা'ছ হায় ?
নির্দ্দয় কঠিন হয়ে কষ্ট দেছ অসহায়ে
মিথ্যা কথা কহিয়াছ সদা সর্ব্বক্ষণ,
পিতা মাতা গুরুজনে দুঃখ দেছ জেনে
শুনে
পুরস্কারে বাধা ইথে কি আছে এমন ?
পড়িয়াছ সমস্ত পুরস্কার লয়ে হাতে
হাসিতে হাসিতে এস যাই গৃহে আজ।
চরিত্রের তরে ভাই পুরস্কার হয় নাই
পড়া বলে সেই ধনে লভে সর্ব্বজনে।
অমলা। কি বলিলে প্রিয়বোন্‌ লাজে মরে যাই
একটু কি কাণ্ডজ্ঞান নাহি তব ভাই !!
বিদ্যা যে পরমধন্‌ জানে তাহা সর্ব্বজন
সকল ধনের ইহা সার।
কি কাজ গহনা প'রে ? বিদ্যাধনে লাভ
করে
সাধি তাঁর ইচ্ছা বার বার।
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বকালে এধনে রেখেছে তুলে
হৃদয় ভূষণ করি আহা,
অন্য ধন চুরি হয় বিদ্যার যে নাহি ক্ষয়
বঞ্চকে বঞ্চিতে নারে তাহা।

বিদ্যার বলেতে নরে সকলি সাধিতে পারে
জলে শূন্যে করয়ে ভ্রমণ,
সকল বিপদ হরে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে
করে ইহা আলো বিকিরণ।
বিদ্যা লাভে জ্ঞান লাভ জ্ঞানালোকে ধর্ম্ম-লাভ
সার এই সাধুর বচন,
পূর্ণ মনুষ্যত্ব যাহা ধর্ম্মেতেই মিলে তাহা
বিদ্যার মহিমা অগণন।
কিন্তু শুন প্রিয়বোন্ যদি এই বিদ্যাধন
সুনীতিকে ফেলে আসে দূরে
বিদ্যার যে গুণ হায় বিফল হইয়া যায়
পশুর অধম হয় নরে।

সরলা। তবে কি বিমলা, লীলা পারেনা এবার
পড়া শুনা করে শেষে তার পুরস্কার?

অমলা। কে বলে পারেনা ভাই? দুঃখিতা যখন
হইয়াছে মন্দ কাজে শিক্ষিতা মতন;
নিশ্চয় পাইবে এবা পরীক্ষার ফল।

বিমলা। আচ্ছা দিদি শিক্ষাতে কি হয় অমঙ্গল?
প্রমীলার মাতা বলে মেয়েরা ইস্কুলে গেলে
ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটে এ সংসারে।

অমলা। পাগল বিমলা কভু তাকি হতে পারে।
ভাবিয়া দেখনা মনে এদেশের শুভদিনে
আছিলেন সুশিক্ষিতা কত,
খনা গার্গি লীলাবতী সীতা আদি কত সতী
ভারত রমণী শ্রেষ্ঠ যত!
কলঙ্ক তাঁদের নামে রটে নাই কোন দিনে
চির দিন ভারতীয়গণ,
প্রভাতে উঠিয়া কত-দেশে দেশে শত শত
স্বরে আগে তাঁদের চরণ।
তাই বলি প্রিয়বোন্ বিদ্যাই পরমধন
ইথে কিছু নাহিক সংশয়,
কিছু দিন শিক্ষা করে নাটক নভেল পড়ে
কেহ যদি কভু নষ্ট হয়,
কি দোষ বিদ্যার তবে দেখনা বারেক ভেবে
কেন তবে বৃথা এ কল্পনা?
কেহ বলে অহঙ্কার সুশিক্ষিতা বালিকার
হবেই নিশ্চয় আছে জানা,
কিন্তু ইহা মহা ভ্রম, শিক্ষিতা বিনয়ী হন
গৃহ কার্য্যে সদা তাঁর মতি,
পিতা মাতা গুরুজনে সদা কায়মন প্রাণে
সেবা ক'রে সুখি হন সতী।

লীলা। বিদ্যা শিক্ষা ফল দিদি বুঝিনু এখন
মন প্রাণ এক করি সাধ্যমত যত পারি
দিন দিন বিদ্যা লাভে করিব যতন।

সরলা। বুঝিলাম নীতি হীন বিদ্যা কিছু নয়,
নীতিই জীবন পথে পরম সহায়।

বিমলা। কি আর বলিব দিদি ধন্য তব জ্ঞান,
আজ তুমি দয়া করে, কত শিক্ষা দিলে মোরে
ঈশ্বর সাধুন তব অশেষ কল্যাণ।

অমলা। আমি কি শিখাতে পারি, যাঁহার কৃপায়
লভিয়াছি জ্ঞান ভাই এই ভূমণ্ডলে;—
এস আজ সবে মিলে নমি তাঁর পায়,
সুপথে রাখুন তিনি মোদিগে সকলে।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামের উত্তর পাড়াস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উদ্দেশ্যে এই পদ্যটী চারি জন বালিকা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। দুই এক স্থল সংশোধন করিয়া প্রকাশিত হইল। স-সং।



পিতা মাতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ।

তোমরা বোধ হয় চীন দেশের নাম শুনিয়াছ। সেখানকার লোকদিগের সহিত আমাদের বড় মিল নাই। তোমরা পুস্তকে পড়িয়াছ যে, সে দেশের পুরুষেরা মাথায় "বেণী" রাখে। আবার সে দেশের মেয়েরা পা ছোট করিবার জন্য লোহার জুতা পড়ে। এই সব পড়িয়া শুনিয়া তোমাদের হয়ত ধারণা হইয়াছে যে, তাহারা বড় অসভ্য। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তাহারা [illegible] সভ্য। তাহাদের স্ত্রী[illegible] কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অল্প দিনের একটী ঘটনার কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহারাও সভ্য এবং তাহাদের মধ্যেও অতি বিশুদ্ধ অনুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

চিয়েন নামে একটী বালিকার মাতার যকৃতের পীড়া হয়। তিনি তাহাতে এত কষ্ট পাইতেন যে, বেদনায় রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতেন না। চিয়েন তখন প্রত্যহ রাত্রিতে উঠিয়া মাতার গায়ে হাত বুলাইয়া দিত এবং যতক্ষণ মার ঘুম না হইত ততক্ষণ জাগিয়া থাকিত। অন্যান্য সেবা শুশ্রূষারও ত্রুটি হইত না। এইরূপে বালিকা দিন রাত্রি মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল কিন্তু ব্যারাম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসরও গত হইল তবুও ব্যারামের হ্রাস হইল না। বালিকা অনিদ্রায় ও প্রায় অনাহারে অবিশ্রান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে চিকিৎসক বলিলেন "যে জীবিত মনুষ্যের মাংস আহার না করিলে এ পীড়ার উপশম হইবে না।" তখন মাতৃভক্ত চিয়েন আপনার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিলেন এবং মাতাকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে তাহার পিতার চক্ষুতে কি এক ব্যারাম হয়। তখন চিয়েন পিতার চক্ষুর পুঁজ ও রক্ত নিজে মুখে করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। বল দেখি, তুমি আমি হইলে কি করিতাম? হয়ত ঘৃণায় কাছেও যাইতাম না, কিন্তু যে মার জন্য নিজের শরীরের মাংস কাটিয়া দিতে পারে, তাহার নিকট এ অতি সামান্য কথা।

কিন্তু ইহাই শেষ নয়। কয়েক দিন পরে চিয়েনের বিবাহ হইল। তিনি অতি কষ্টে পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গেলেন। অল্প কয়েক [illegible] না যাইতে সংবাদ আসিল তাহার পিতা অতিশয় পীড়িত। তিনি একদিনে পিত্রালয়ে চলিলেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবারে কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। এই রোগেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। বলিতে পার যে তখন সেই পিতৃ ভক্ত চিয়েন কি করিলেন? তিনি পিতার শোকে এত অধীর হইলেন যে, তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহার করিয়া অবশেষে পিতার সহিত পরলোক গমন করিলেন। ধন্য চিয়েন। ধন্য তোমার মাতৃ ভক্তি। ধন্য তোমার পিতার প্রতি অনুরাগ। মাতা যেন তোমার ন্যায় সন্তানই গর্ভে ধারণ করে; পিতা যেন তোমার মত কন্যারই জন্মদাতা হন। পিতা মাতাকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, তুমি

তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছ এবং উপযুক্ত পুত্র কন্যারা ইহা হইতে চিরকাল উপদেশ পাইবে।

দুই খানি ছবি।

(বড় বালকদিগের জন্য লিখিত।)

ছোট খানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খোলার ঘর। তাহার ভিতরে একখানি ছোট বিছানায় তারক কর্ম্মকার [illegible] শুইয়া পড়িয়া আছে। পাশে স্ত্রী ও দুই সন্তান [illegible] ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। বড়টী চৌদ্দ বৎসরের বালক, ছোটটী কন্যা—বয়স প্রায় তিন বৎসর।

জননী মাথা হেঁট করিয়া স্বামীর মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন, আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারার মত জল বহিয়া পড়িতেছে, যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই সংসারে সুখে কাটাইতেছিলেন, সেই স্বামী আজ তাঁহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন। দুটী সন্তান লইয়া এ সংসারে আজ তিনি অনাথা হইলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা ঘন মেঘের মত তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। আহা! দুঃখিনী মার যে আর দাঁড়াইবার জায়গা নাই। শিশু দুটী লইয়া কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন? এই সকল চিন্তায় তাঁহার হাসি মাখা মুখ খানিতে দুঃখের ছায়া পড়িয়াছে।

বাবার এই অবস্থা ও মার এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া হরিনাথ বড় ভয় পাইয়াছে। সে গম্ভীর ভাবে বাবার দিকে চাহিয়া আছে, মাঝে মাঝে তাহার চক্ষে জল আসিতেছে কিন্তু পাছে মা দেখিতে পান এই ভয়ে এক এক বার অন্য দিকে মুখ ফিরাইতেছে। শিশু কামিনী এসব কিছুই বুঝিতেছে না, সে খানিক ক্ষণ পূর্ব্বে এটা ওটা লইয়া খেলা করিতেছিল, হঠাৎ মাকে কাঁদিতে দেখিয়া ছুটিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ও একবার বাবার দিকে একবার দাদার দিকে তাকাইয়া শেষে মার কাপড় ধরিয়া টানিতেছে আর "মা," "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। কতক্ষণ পরে তারক নাথ পুত্রের এক খানি হাত নিজের ক্ষীণ হা[illegible]য়া চাপিয়া বলিতে [illegible] আমি এখন যাই। ভগবান আমায় বড় মানুষ ক'রে এখানে পাঠান নাই। সুধু এই দুটী হাত আর ভাল চরিত্র দিয়েছিলেন, এদেরি বলে আর তাঁহার দয়ায় এ সংসারে আমি সুখে কাটিয়েছি। লোকে তারক নাথকে বড় মানুষ ব'লে জানত না কিন্তু খাঁটি লোক ব'লে বিশ্বাস করত। বাছা, আমার এই সুনাম রেখো। আমার কুলে কোন দিন কোন কলঙ্ক নাই, দেখো তোমা হ'তে যেন কোন দাগ না পড়ে। এই তোমার মা বোন রইলেন; এঁদের সুখে রাখতে খুব যত্ন করো, তোমারি মুখপানে চেয়ে তোমার মা সব দুঃখ ভুলবেন। প্রাণ গেলেও পাপের পথে পা দিও না; চিরকাল ভগবানে মতি রেখে তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে সব কাজ করো। তিনি তোমায় ভাল করবেন, সব দুঃখে তিনিই তোমায় রাখবেন।" এতগুলি কথা

বলিতে বলিতে পিতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে হরিনাথের হাত ছাড়িয়া দিলেন এবং এক খানি হাত দিয়া তাহার মাথা বুকে চাপিয়া ধরিলেন আর এক খানি হাত বাড়াইয়া শিশু কন্যার মাথার উপর রাখিলেন এই ভাবে চক্ষু দুটী মুদিয়া প্রার্থনা করিলেন "ভগবান্! এই দুটী ধন তোমারি হাতে সঁপিয়া যাই। এদের তুমি চিরকাল তোমারি পথে রেখো, হরি। কাঙালের তুমিই ভরসা—" বলিতে বলিতে চক্ষুর দুই পাশ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ক্রমে স্বর বন্ধ হইয়া গেল, যে চক্ষু মুদিয়া ছিল তাহা আর খুলিল না। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল আঁধার হইল, হরি এ সংসারে পিতৃ হীন হইল।

হরিদের বাড়ী হইতে এ
ওপাশে দত্ত বাবুদের প্রকাণ্ড
রামকান্ত বাবু এক
ও তাঁহার পিতা
উপার্জ্জন করিয়াছেন। প্রকাণ্ড জমিদারী—তাহার বার্ষিক আয় অনেক টাকা। এ ছাড়া কোম্পানীর কাগজ আছে আর এক কলিকাতা সহরেই অনেকগুলি বড় বাড়ী আছে। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, বিধবা কন্যা, ও একটী পুত্র নাম শচীকান্ত।

আজ রামকান্ত বাবুর সদর দরজায় সাত আট খানা গাড়ী। কত লোক আসিতেছে ও যাইতেছে সংখ্যা নাই। রামকান্ত বাবু কয়েক দিন হইতে ভয়ানক রোগে শয্যাগত হইয়া আছেন। সহরের বড় বড় ডাক্তারের বিদ্যা বুদ্ধিতে যাহা কুলায় সেরূপ ঔষধ পত্র ও সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি নাই। বাবুর অনুগত কত লোক দিন রাত্রি তাঁহার সেবা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। আজ পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রি হইতে বাবু অজ্ঞান হইয়া আছেন। অনেক চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতেছে না। তাই তিন চারি জন ডাক্তার ও বড় সাহেব ডাক্তার আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন, কেহ ঘড়ি খুলিয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতেছেন, কেহ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আছেন, এইরূপে রোগীর শুশ্রূষায় সকলেই ব্যস্ত। রামকান্ত বাবুর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবে তাঁহার শয়ন করিবার ঘর পূরিয়া গিয়াছে, যত লোক আসিতেছে সকলকে সে ঘরে ধরিতেছে না তাই পাশের এক ঘরে তাঁহাদের বসিবার জায়গা হইয়াছে সকলেরই মুখ যেন চিন্তায় ঢাকা। হঠাৎ ডাক্তার সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাড়াতাড়ি বুকের কাছে কান আনিলেন, এইরূপে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সাহেবী ভাষায় বলিয়া উঠিলেন "হইয়া গিয়াছে।"

* * *

মৃত্যুর কাছে ছোট বড় বিচার নাই। ঐ রাজ অট্টালিকার মত প্রকাণ্ড বাড়ীতে ধনীর সন্তান শচীকান্ত আর এই ক্ষুদ্র কুটীরে গরিবের সন্তান হরিনাথ ইহার প্রতাপে এ সংসারে পিতৃহীন হইল। ইহাদের দুই জনের অবস্থার কত প্রভেদ। চৌদ্দ বৎসরের বালক হরিনাথের মাথায় আজ সংসারের ভার আসিয়া পড়িল। সে দুঃখীর সন্তান হইলেও এতদিন সংসারের কোন ভাবনা চিন্তা জানিত না। তাহার বাবা তাহাকে অনেক দিন পাঠশালায় পড়াইতে পারেন নাই। বার বৎসরের সময় পড়া ছাড়াইয়া আপন কাজে লাগাইয়া দেন। হরি পড়িতে বড় ভাল বাসিত। স্কুল ছাড়িয়া আসিলেও সে পড়িবার সুখ ভুলিতে পারে নাই; সে যথাসাধ্য বাবার দোকানে খাটিত আর অবসর পাইলেই তাহার সমবয়সী আর আর ছেলেদের মত খারাপ আমোদে যোগ না দিয়া কোন ভাল বই পড়িত। এইরূপে সে এতদিন

আপনার কাজ ও চিন্তা লইয়া আনন্দে কাল কাটাইত। খাওয়া পরার ভাবনা বড় একটা ভাবিতে হইত না, কিন্তু ভগবান তাহাদের সে সুখে আর অনেক দিন সুখী থাকিতে দিলেন না। যার মুখের দিকে তাকাইয়া সে আনন্দে ছিল আজ ভগবান তাহার সেই স্নেহময় পিতাকে কাড়িয়া লইলেন। আহা! অভাগা হরির কথা ভাবিতেও প্রাণ ফাটিয়া যায়। সে এই ভয়ানক আঘাত সহিতে পারিল না, দুঃখ ও শোকের ভরে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতার সৎকার করিয়া যখন সে গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন আর তাহার পূর্বের ভাব নাই। পিতার শোক, তাহার উপর সংসারের চিন্তা—এই সকল ভাবনা যেন একদিনেই তাহার আরও দশ বয়স বাড়াইয়া দিল।

শচীকান্ত বাবুর এ সংসারে জ্বালা কিছুই নাই, পিতার মৃত্যুতে যে কিছু শোক হইয়াছিল তাহা আর অধিক দিন রহিল না। সে মহা ধুমধামে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া সে শোক দূরে ফেলিল। শচীকান্ত জানিত বাবা উইল করিয়া তাহাকে পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, আর কয়েক বৎসরেই সে সমুদয় বিষয় হাতে পাইবে। এই খবরে শচীকান্ত মনে মনে ভারি খুসী। ভাবেন "আর ভাবনা কি? এতগুলি টাকা আমার, দুই হাতে খরচ করিলেও ফুরাইবে না। পায়ের উপর পা তুলে সুখে ব'সে থাব আর মজা করব। লেখা পড়া? আমার লেখা পড়া শিখ্‌বার দরকার? যাদের কোন পুরুষে টাকার মুখ দেখে নাই তারাই লেখা পড়া করুকগে, কেরানীগিরি করে খাবে। আমি কেন লেখা পড়া করব?" শচী বাবু মনে মনে এই সুসংকল্প করিয়া কালী কলম ও বইএর সঙ্গে চিরদিনের মত সম্পর্ক ঘুচাইবেন ঠিক করিয়া আছেন, কিন্তু মায়ের ভয়ে আর কতকটা চক্ষু লজ্জার খাতিরে সেটা কাজে করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া এখনও স্কুলে যাইতে হয়, কিন্তু সেরূপ পড়া শুনা করার চেয়ে না করা অনেক গুণে ভাল। তিনি মাথায় সুগন্ধি তেল মাখিয়া লম্বা সিঁথি কাটিয়া, দিন্ ফিনে কোঁচান ধুতি পরিয়া, ধপ্‌ধপে ইস্তিরি করা ভাল জামায় সোণার ঝক্‌ঝকে চারি পাঁচটা বোতাম ও ফুল গুঁজিয়া জুড়ি হাঁকাইয়া স্কুলে যান। সেখানে গিয়া দেশের যত বখাটে ছেলের সঙ্গে ইয়ার্‌কি দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাত এই, ইহার জন্য জাঁক বা কত। পড়িবার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর হইয়াছে, সুন্দর কার্পেট পাতা, দেয়ালে [illegible] ছবি, চেয়ার টেবিল, কোচ, সাজের অপ্রতুল নাই, বসিয়া থাকেন, পড়িবার মধ্যে যত বাজ্যের অপাঠ্য নবেল। এই লইয়াই দিবা রাত্রি বাস। এইরূপে অগাধ বিষয়ের এক মাত্র উত্তরাধিকারী শচীকান্তের শিক্ষা আরম্ভ হইল।

সিমলা ষ্ট্রীটে একটা বড় দোকানে হরিনাথ কাজ করে। তাহার বাবার যে দোকান খানি ছিল হরিনাথ তাহা একা চালাইতে পারিল না; তাই সেখানকার দোকান পাট উঠাইয়া দিয়া এখন লালমোহন কাঁসারির দোকানে কাজ করে। বাবা মরিবার সময় যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, হরিনাথ সেগুলি প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছে এবং তদনুসারে কাজ করিতে খুব চেষ্টা করে। প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রাণপণে যত্ন, কি রূপে ভাল কাজ করিবে, কি প্রকারে ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবন কাটাইবে, কিসে আর মনে কষ্ট

টুকু সুখ দিবে, এই সকল ইচ্ছা সাধু প্রকৃতি হরিনাথের মনে সর্ব্বদাই আগুনের মত জ্বলিতেছে। খাটিতে খাটিতে শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িলে মৃত্যু শয্যায় শয়ান পিতার কথা মনে পড়ে, পিতৃহীন বালক চক্ষুর জল মুছিয়া আবার নূতন উৎসাহ ও আশা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যে বেতন পায় হরিনাথ তাহার এক পয়সাও নিজে ব্যয় করে না। বেতন পাইলেই আনন্দে পূর্ণ হইয়া বাড়ীতে ছুটিয়া যায়। ধনশালী বণিক প্রচুর ধন গৃহে আনিয়া যে আনন্দ না পান মাতৃবৎসল হরিনাথ মায়ের হাতে পরিশ্রমের টাকাগুলি গণিয়া দিয়া ততোধিক আনন্দ পায়।

পি মৃত্যুর পর হরি— রে কাটি ..য়াছে। সকল দি কে না, হরিনাথেরও সে দিন নাই. ব মনোমত কার্য্য করিয়া সে এখন তাঁহার প্রিয়..এ হইয়াছে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বের মত আর তাহার অন্ন বস্ত্রের ভাবনা নাই কিন্তু ভাল অবস্থা হইলে অনেকে যেমন অলস ও আমোদপ্রিয় হইয়া পড়ে, হরিনাথের তাহা হয় নাই। বরং কৃতকার্য্য হইয়া নূতন উৎসাহ ও আশার সহিত কাজ করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়ী আসিয়া আহার করিতে করিতে মার কাছে সারাদিনের কাজের হিসাব দেওয়া হরিনাথের জীবনের এক প্রধান সুখ। কি কাজ করে, কেমন করিয়া করে, দোকানের সকলের সঙ্গে কেমন সদ্ভাব, সকলে তাহাকে কেমন ভাল বাসে, তার প্রভু তাহার কাজ দেখিয়া কেমন খুসী হন, কত ভাল কথায় উৎসাহ দেন, এই সকল কথাও প্রভুর প্রশংসা যখন শত মুখে করিতে থাকে, তখন দুঃখিনী জননী এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া সব কথা শোনেন এবং আনন্দে হাসিতে থাকেন, আর যিনি তাঁহাকে শত দুঃখের মধ্যে এই রত্ন দিয়াছেন তাঁহাকে মনে মনে প্রাণ ভরিয়া ডাকেন। মার মুখে হাসি দেখিয়া মাতৃবৎসল সন্তানের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না, তার সকল ক্লান্তি যেন ঐ হাঁসি টুকু দূরে ফেলিয়া দেয়।

ক্রমশঃ।



জল কণার গল্প।

খোকার জল খাইবার ছোট গেলাসটীতে বিরানব্বই লক্ষ কোটী জলের অণু আছে। তাহারা কি সকলেই এক স্থান হইতে আসিয়াছে? ঝি তাহাদিগকে কলসী হইতে আনিয়াছে বটে, রামা চাকর কলসীতে করিয়া তাহাদিগকে পুকুর হইতে আনিয়াছিল বটে, কিন্তু পুকুরে তাহারা কোথা হইতে আসিল? খোকা এই কথা ভাবিতেছে। জল কণারা যদি কথা কহিত, আর খোকা যদি তাহাদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত তবে অবশ্যই তাহারা তাহার উত্তর ভালরূপ দিতে পারিত। ইহার উত্তরে তাহারা কত আশ্চর্য্য গল্পই বলিতে পারিত। মনে কর খোকা এক একটীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর তাহারা উত্তর দিতেছে:—

১। আমরা তিন হাজার জড়াজড়ি করিয়া টুপ্ করিয়া আকাশ হইতে লাফাইয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

২। আমরা যা'ট্‌লক্ষ রাত্রিকালে গাছের পাতায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে গড়াগড়ি করিয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

৩। আমরা ডাঙ্গা হইতে পুকুরে নামিয়াছিলাম।

৪। আমরা দলে দলে পর্ব্বত হইতে সমুদ্রে যাইতেছিলাম। পথে বালুকণার ফাঁকের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিলাম। শেষে কষ্টে সৃষ্টে সেই বালির ভিতর দিয়া এখানে আসিয়াছি।

খোকার ক্ষুদ্র মাথায় গোল লাগিয়া গেল। তাহার জিজ্ঞাসা ফুরাইল না। সে [illegible]বো কত শত কথাই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। কত কথাই সে শিখিল [illegible]। ইহারা বলিল "এককালে আমরা সকলেই সমুদ্রে ছিলাম। এখন খোকা বাবু আমাদিগকে গেলাসে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিতেছে; তখন আমরা তোমাদের বড় বড় জাহাজগুলিকে ইচ্ছা করিলে গিলিয়া ফেলিতে পারিতাম। সমুদ্র হইল কি না আমাদের সমাজ। সমুদ্র আর কি? আমরাইত সমুদ্র। সমুদ্রে যখন ছিলাম, বেশ ছিলাম।

"একবার বড় গরম হইল। গরম হইলে অনেকগুলি গা ঘেসাঘেসি করিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হয়। আমরা ফাঁক ফাঁক হইয়া বাতাসে মিশিয়া আকাশে উঠিলাম। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কত স্থানেই গেলেম, কত তামাসাই দেখিলাম। তখন কিন্তু আমাদিগকে কেহই দেখিতে পাইত না—আমরা বাতাসের ভিতরে ছিলাম।

"এক দিন বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। আমরা তখন বাতাসের বাহিরে আসিয়া দলবদ্ধ হইলাম; মনে করিলাম নীচে নামিয়া দেখি কেমন লাগে। তখন তোমরা আমাদিগকে দেখিতে পাইলে, আর মেঘ বলিয়া ডাকিলে। যখন আমরা শীতে পড়িতে লাগিলাম, তখন তোমরা বলিলে 'বৃষ্টি হইতেছে'। আমাদের কেহ কেহ তোমাদের পুকুরে পড়িলাম। কেহ কেহ অন্য স্থানে পড়িয়াও শেষে কেমন করিয়া পুকুরেই আসিল। আর সকলের কি হইল বলিতে পারি না—"

এমন সময়ে খোকার পাতে সন্দেশ পড়িল। খোকা অমনি সব ভুলিয়া গিয়া সন্দেশ লইয়া ব্যস্ত হইল। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। খোকার লোভ একটু কম হইলে আমরা জল কণা-দে[illegible]া কত গল্প শুনিতে পা[illegible]



রাগ।

"দাদা পেল বড় সন্দেশ, দিদি পেল আর,
আমায় দিলেন সব ছোট টা একি অন্যায় মা'র;
তাইতে আমি রইছি ব'সে কিছুই খাব না,
এম্‌নি করে থাক্‌লে পরে জব্দ হবেন মা।
এইটী ভেবে কিরণ বাবু মুখটী করি ভার
আছেন ঘরে, সাধ্‌তে তাঁরে কেউ এসে না আর।
পেটুটি বলে "আর তো আমি পারিনে রে ভাই
চুপে চাপে দাওনা কিছু একটু খানি খাই।"

কিরণ বলে "রাগ করেছি শান্ত হয়ে থাক"
উদয় বলে "রাগতো শেষে আমায় আগে বাথ।"
বিরস মনে কিরণ বাবু কাঁদেন ধীরে ধীরে
পায়ে পড়ে উদয় ভায়া দিচ্ছেন মাথায় কিরে।
পেটের সনে ঝগড়া ঝাটি কার কতক্ষণ শয় ?
উদয় চাঁদের মুখের আজ্ঞা না শুনিলে নয়।
ভেবে চিন্তে কিরণ তবে ধীরে ধীরে উঠি,
এদিক ওদিক, সেদিক চেয়ে, যান গুটি গুটি।
খাবার ঘরে কিরণ বাবু যাই দিয়েছেন পা
বাঁ দিকেতে দাদা দিদি, ডাইনে এলেন মা!
রাগের বড়াই দেখে সবাই হেসে কুটি কুটি
লজ্জা পেয়ে কিরণ বাবু ঢাক্‌লে আঁখি দুটি।
কোলে করে মা তাহারে খাওয়া'ন তাড়াতাড়ি
পেটের সনে মিট্‌লো গোল, রাগের মাথায় বাড়ি।



ভাই বোন্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় বার বছরের কথা। সেই ১২৮২ সালের কার্ত্তিক মাসের কথা মনে পড়ে কি? সেই কার্ত্তিক মাসে কত গরিব ধনী হইয়াছে কত ধনী গরিব হইয়াছে আবার কতজন চিরকালের জন্য ধন ও দরিদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে!

লোকে বলে ১৩ই কার্ত্তিক ঝড় বৃষ্টি হওয়া বার্ষিক কার্য্য। এ প্রবাদ সকল দেশে প্রচলিত আছে কি না জানি না। কিন্তু আমরা তখন প্রত্যেক বছরই কার্ত্তিক মাসের ১৩ই-র জন্য অপেক্ষা করিতাম। প্রায় প্রত্যেক বছরই আমাদের আশা পূর্ণ হইত কিন্তু ১২৮২ সালে যেরূপ হইয়াছে ঈশ্বর যেন এরূপ আর কখনও না করেন!!

৮২ সালে ও ১৩ই কার্ত্তিকের ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাবিলাম অল্পেই শেষ হইবে। দিন গেল ঝড় বৃষ্টি থামিল না। সে দিন রাত্রিতে সকলে ভাবিল ১৪ই প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার হইবে। কিন্তু সে আশা সফল হইল না। ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই [illegible] বৃষ্টি ও ঝড় হইল। কখনও বা একটু কমে আবার [illegible] বা দ্বিগুণ বেগে ঝড় আসে। অনেক গরিবের খা [illegible] হইল অনেকের ঘর পড়িয়া গেল। শেষে সকলেই বলিল "সাইক্লোন্" হইয়াছে। কয়েক দিন পরে সংবাদ আসিল "দৌলতখাঁ"র জলপ্লাবন হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক সেই জল স্রোতে চিরদিনের জন্য ভাসিয়া গিয়াছে।

সেই ১২৮২ সালের ১৫ই কার্ত্তিক সন্ধ্যার পর দৌলতখাঁর এক বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। নিকটে একটী নয় বৎসরের ছেলে এবং ১২ বৎসরের একটী মেয়ে। ইনি কি কাজ করিতেন তাহা বলিব না কিন্তু কোন বড় কাজ করিতেন। নাম——বসু। ঘরের দোরে বসে বাহিরের দিকে আকাশের দিকে চাহিতেছেন। ঘরের মেজেতে গৃহিণী একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া নীরবে কি ভাবিতেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ছেলেটী বলিল "বাবা, মাঠেরদিকে ও সাদা সাদা কি দেখা যাচ্ছে?"

বাবা। "জল।"

ছেলে। "ও কি বৃষ্টির জল বাবা?"

বাবা। "না বাবা, নদীর জল বেড়েছে। শুন্‌লে না, রাম বাবু তখন বলিলেন ক্রমেই জল বাড়িতেছে।"

মেয়ে। "হাঁ বাবা তবে কি বাড়ীতে জল উঠবে?"

বাবা। "কি জানি মা, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমরা থাকিতে তোমাদের ভয় কি?"

পিতার আশ্রয় পাইলে আর ভয় কি? পিতার আশ্বাস পেয়ে ছেলে ও মেয়ে চুপ করে কি ভাবিতে লাগিল। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গেও আবার বেশী হলো। সাদা জল অদৃশ্য হইল। জল বাড়িতেছে কি কমিতেছে কে জানে? ঈশ্বর ভরসা করি। বাবু ঘরের ভিতরে গেলেন।

ক্রমে খাওয়ার সময় হইল। মা, খোকাকে বিছানায় [illegible] রেখে সকল কাজ সারিলেন। আবার খোকাকে কোলে করে বসিলেন। তখন মেয়ে এসে মার কাছে বসিল। মা বলিলেন:—

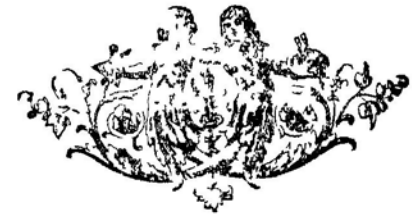
"কুসুম, তুই কি ভাবিতেছিস্?"

কুসুম বলিল "না, মা, বেশী কিছু ভাবছি না, তবে মনে হচ্ছে যেন জল খুব বাড়িতেছে। আজ রাত্রেই বোধ হয় সকল ভাসিয়া যাইবে। আমরা জলের স্রোতে কোথায় যাইব কে জানে? মা, আর কি আমরা——"

বলিতে বলিতে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। সুরেশ ক্রমে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলিল "দিদি তুই কাঁদ্‌ছিস কেন? বাবা কি বলিলেন তা শুনিস্ নি? বাবার কাছে আমাদের ভয় কি? বাবা আমাদের কোলে করে সাঁতরিয়ে নিয়ে যাবেন এখন; খোকা তো মার কোলেই রয়েছে। তবে আর ভয় কি? কেমন মা?"

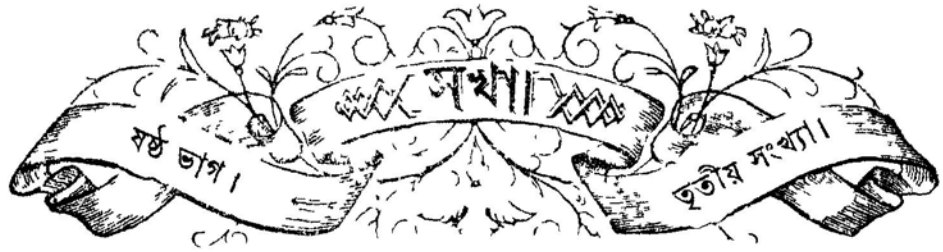
মা বলিলেন "হাঁ, তাইতো।" কিন্তু মা বুঝিয়াছিলেন যে তিনি কিম্বা বাবা রক্ষা করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর ভিন্ন এ বিপদে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। রাত্রি অধিক হইল। সুরেশ ও কুসুম একত্র ঘুমালো। পাছে ঘুমের মধ্যে জলে ভেসে যায় এই ভয়েই যেন দুই ভাই বোনে একত্রে পরস্পরের গায়ে হাত রেখে শয়ন করিল। সে দৃশ্য কি চমৎকার!! জলের স্রোতের ভয়ে ভাই বোনের স্নেহ দৃঢ়বদ্ধ হইল। মা বাপ সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইলেন। রাত্রি আরও গভীর হইল। তাঁহারা ঈশ্বর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে শয়ন করিলেন।

ক্রমশঃ।



ধাঁধা।

তিন অক্ষরে নাম মোর সবে করে ভয়
অথচ সকলে লয় আমার আশ্রয়।
মধ্যম ছাড়িয়া আমি সব সঙ্গে থাকি।
মাথা কেটে শত্রু হ'তে আমি দেশ রাখি।
কোথায় বসতি মোর কোথায় গমন
নাহি জানে কেহ; বল আমি কোন জন?



মার্চ্চ, ১৮৮৮।

দুইখানি ছবি।

(২৯ পৃষ্ঠার পর।)

শচীকান্তেরও পিতার মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু বয়সে তাহার দোষগুলি না কমিয়া বরং বাড়িয়াছে। ষোল বৎসরের বালক ইহারই মধ্যে ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধনের অহঙ্কারে ইহারই মধ্যে আপাদ-মস্তক পরিপূর্ণ হইয়াছে। পদ্ম ফুলের মত সাজিয়া মূর্ত্তিমান অহঙ্কার স্বরূপ হইয়া যখন পিতার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীগণের উপর অসম্মান ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতে থাকে তখন তাঁহারা ইহার ভাবী অবস্থা ভাবিয়া মনে মনে শোক করেন। পূর্ব্বে স্কুলে পড়িতে যাওয়া একটা নাম ছিল, এখন তাহাও নাই। স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া সে এখন পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিয়াছে। এক দিন স্কুলের একটা পরীক্ষার সময় শচীকান্ত স্বচ্ছন্দে বই খুলিয়া উত্তর লিখিতেছিল, এমন সময় শিক্ষক দেখিতে পাইয়া তাহাকে পরীক্ষাস্থল হইতে বাহির করিয়া দেন, এবং আর কখনও এইরূপ করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্লাসের সকল ছেলের সাম্‌নে [illegible] না চাহিলে তাহাকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন এই আদেশ প্রচার করেন। পাঁচ লক্ষ টাকার অধিপতি শচীকান্ত বাবু কি একটা মাইনে করা মাষ্টারের কাছে ক্ষমা চাহিতে যাইবেন? এত অপমান? না, কখনই না, প্রাণ গেলেও না। তিনি ইচ্ছা করিলে অমনি কত গণ্ডা মাষ্টারকে কিনিতে পারেন আর তিনি কিনা তার কাছে মাথা হেঁট করিবেন। ক্ষমা চাওয়া হইল না। সেই দিন হইতে শচীকান্তের সহিত স্কুলের সম্পর্ক চির-দিনের মত ফুরাইল।

যাহাহউক আসল কাজে মন থাকুক বা নাই থাকুক তবুও রোজ রোজ স্কুলে যাওয়া শচীকান্তের একটা কাজের মধ্যে ছিল। সেখানে আর কিছু হউক বা না হউক, দশটা ছেলের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়াও সময়টা যাইত, এখন সেটাও গেল। কিন্তু এখন সময় কাটে কি করিয়া? কাজেই তার জন্য বাহিরের একটা উপায় দেখিতে হইল। কলিকাতা সহর, আমোদের ভাবনা নাই। আজ থিয়েটার, কাল সার্কাস, অন্যদিন অপেরা এইরূপ করিয়া দিন যায়। সন্ধ্যার পরে আর বাবুকে ধ'রে রাখা ভার। যে সকল থিয়েটারগুলির নাম করিলেও পাপ, বাবুর সেইগুলি এখন তীর্থ স্থান হইয়া উঠিয়াছে। এক দিন যাইতে না পারিলে সে দিনটা বৃথায় যায়! পাপের সহচর বন্ধুও অনেকগুলি জুটিল। এইরূপ একটী একটী করিয়া শচীকান্তের অধোগমনের সিঁড়ি তৈয়ার হইতে লাগিল।

কামাখ্যাচরণ বসু রামকান্ত দত্তের অনেকদিনের বন্ধু। অতিশয় ভাল লোক। মৃত্যুকালে রামকান্ত বাবু তাঁহারই হাতে স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার দিয়া যান। তিনিও আপনার মত মৃত বন্ধুর বিষয় সম্পত্তি অতি যত্নে রক্ষা করিতেন। শচীকান্তের নাবালক অবস্থায় তাঁহারই হাতে এখন সমুদয় বিষয়। শচীকান্তের মত টাকা মাসিক বরাদ্দ, তাহা তিনি নিজের হাতে তাহাকে দেন এ সকলের এদিক ওদিক হইবার যো নাই। কিন্তু আজ কাল শচী বাবুর আর পূর্ব্বের মত অল্প টাকায় চলে না, দেখিতে দেখিতে টাকাগুলি যেন পাখা তুলিয়া উড়িয়া যায়। সুতরাং কামাখ্যা বাবুর কাছে নিত্য নূতন খরচের টাকার জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। কামাখ্যা বাবু শচীকান্তের আজ কাল কার ব্যবহারে বিশেষ অসন্তুষ্ট, বিশেষতঃ তাহার ঐরূপ স্কুল ছাড়িয়া আসার কথা শুনিয়া অবধি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার উপর আবার তাহার এইরূপ অপব্যয়িতা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু তাহা সহসা পারিলেন না। কামাখ্যা বাবু বুদ্ধিমান লোক। শচীকান্ত তাঁহাকেই যা কিছু ভয় ও সম্ভ্রম করে, পাছে অবশেষে তাহাও যায় এই ভয়ে এবং স্নেহের আকর্ষণে যদি সুপথে থাকে, এই আশায় পূর্ব্বের মত তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে ও ইচ্ছামত টাকা দিতে লাগিলেন।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। হরিনাথ এখন ২১ বৎসরের যুবা। একদিন রাত্রিতে যে কুটীরে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই কুটীরে হরিনাথ বসিয়া মাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সে এখন আর পূর্ব্বের মত বালক নাই, শরীর সুস্থ ও সবল। মুখখানি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। দেখিলেই বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, ও মিতাচারী বলিয়া বোধ হয়। হরিনাথ বলিতেছে "দেখ মা, বাবা যেদিন মরিলেন সেদিনকার কথা আজও আমার বেশ মনে পড়ে। মা, বাবা মরবার দিন আমাকে যা যা বলে যান, সে কথাগুলি এখনও আমার কাণে বাজে। সেই কথামত কাজ করিতে আমি খুব চেষ্টা করিতেছি। আর একটা ভাল খবর শোন মা, কামিনী কোথা? আজ লালমোহন বাবু আমাকে দোকানের এক জন কারিকর করে দিয়েছেন, আর আমার মাইনে আজ থেকে পোনেরো টাকা করে দিলেন। এই কাজ দিবার সময় আমার পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি যে আমার কত সুখ্যাতি কর্‌লেন তা আর কি বল্‌ব, শুনে লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়ে গেল।"

মা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন "বাবা আজ আমার মত সুখী মাতা আর কেউ নাই। ভগবান্ তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন।" এই রূপ সুখের কথা বার্ত্তায় সময় যাইতেছে এমন সময়ে রাস্তায় একটা বড় গোল উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক চীৎকার শোনা গেল। মাতাপুত্রে চমকিয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ত হইয়া কি হইয়াছে দেখিবার নিমিত্ত দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন দুই তিন জন কনেষ্টবল এক জন যুবা পুরুষকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবার কাপড় চোপড় অতি বিশৃঙ্খল, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেনা, তাহাদের হাত ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না, টলিয়া পড়িতেছে আর জড়ান ভাষায় বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। হরিনাথ দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ওঃ চিনেছি। দত্ত বাবুদের শচীকান্ত বাবু।" মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? অমন করিয়া পাহারাওয়ালায় ধরিয়া লইয়া যায় কেন?"

হরিনাথ ঘৃণায় নাক তুলিয়া কহিল "মাতাল আর কি!"

এই সময়ে কনেষ্টবলেরা দত্ত বাবুদের বাড়ীর কাছে আসিল। দরজায় দুই তিন জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা প্রভুকে এই অবস্থায় পুলিসের হাতে দেখিয়া অনেক অনুনয় করিয়া,তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইল এবং চারি পাঁচজনে ধরা ধরি করিয়া উপর তালায় লইয়া গেল। এই বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া হরিনাথের মাতার চক্ষে জল আসিল। তিনি শচীকান্তের মাতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "হা অভাগিনি! তোমার দুঃখ ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে শচীকান্ত কামাখ্যা বাবুর বাড়ীর দরজায় দর্শন দিলেন। দরওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কামাখ্যা বাবু বাড়ী আছেন?" "আজ্ঞা হাঁ।" তখন আবার হুকুম হইল যাও, শীঘ্র তাঁকে আস্‌তে বল। শচীকান্ত দত্ত তাঁহার সঙ্গে দেখা করতে চান বল গিয়ে। যাও, শীঘ্র যাও।" শচীকান্তকে বসাইয়া ভৃত্য প্রভুকে খবর দিল। অল্পক্ষণ পরেই কামাখ্যা বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি শচীকান্তকে দেখিয়া অল্প হাসিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কামাখ্যা বাবুর অনুরোধে শচীকান্ত বসিয়া কহিল "মহাশয় আপনি জানেন কি যে আমার একুশ বৎসর বয়স হইয়াছে?" "হাঁ জানি।"

"তবে আমি এখন আইন মতে আমার পিতার বিষয়ের অধিকারী হইয়াছি?" কামাখ্যা বাবু মাথা নাড়িয়া উত্তর করিলেন "হাঁ।" "কবে পাইব?" "যেদিন তোমার খুসী।" "তবে যত শীঘ্র পারেন আমার বিষয় আশয় আমার হাতে দিতে বিলম্ব কর্‌বেন না। কাগজপত্র সব ঠিক রাখ্‌বেন, দেরী হয় না যেন। আর আমার আজই পাঁচ হাজার টাকার খুব দরকার, সে টাকাটা আমাকে এখনিই দিন।" শচীকান্তের এইরূপ বলিবার ধরণ ও টাকার জন্য তাগাদা কামাখ্যা বাবুর ভাল লাগিল না। তিনি অনেক সহিয়াছেন কিন্তু আর সহ্য করিবেন না ঠিক করিলেন। গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শচীকান্ত অস্থির হইয়া আবার কহিল "কি। শুন্‌তে পাচ্ছেন মহাশয়?" কামাখ্যা বাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন "হাঁ কাগজ পত্র সবই ঠিক আছে। আর শোন, তোমার হিসাবে এপর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। আমি নিজে সে সকল হিসাব রাখিয়াছি। এখন তুমি সেগুলি কি দেখিবে?" "ওঃ! হিসাব পত্র দেখা? সে সব কাজ পরে হবে। আমার এখন হিসাব দেখবার সময় আদপেই নাই। আজ আমার আবার একটা ভারি কাজ আছে। সকাল সকাল বেরুতে হবে। এখন বলুন কখন টাকা দেবেন?" কামাখ্যা বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন "শোন শচীকান্ত, টাকা তোমার। তুমি যেরূপেই খরচ কর না কেন আমার তাতে কিছুই বল্‌বার নাই। তবে আমি নাকি তোমার বাবার অনেক দিনের বন্ধু, আর ছেলেবেলা থেকে তোমাকে ভাল বাসি ও তোমার মঙ্গল চিন্তা করি, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি এতগুলি টাকা দিয়ে কি কর্‌বে?"

"তা মহাশয়, আপনি যেই হন্‌না কেন, আপনাকে এসব খবর বল্‌তে আমি বাধ্য নই। টাকা আমার, আমি এ দিয়ে যা খুসী তাই কর্‌ব, যেমন ইচ্ছা তেমনি করে ব্যয় কর্‌ব, সে সব বিষয় নিয়ে যে আর কেউ নাড়া চাড়া করে, সেটা আমি আদ-

লেই পছন্দ করিবে। আর আমিত এখন আর ছেলে মানুষ নই।" শচীকান্তের এই গর্ব্বিত উত্তর কামাখ্যা বাবুর প্রাণে বাজিল। তিনি বালক কাল হইতে যাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, যার কল্যাণ চিন্তা তিনি সর্ব্বদাই করেন সেই আজ কিনা অক্লেশে তাঁহাকে এমনি করিয়া ঘাড় তুলিয়া মুখ বাঁকাইয়া দশ কথা শুনাইয়া দিল। তাঁহার বয়স ও তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা এ সকলের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইল না। এই ভাবিয়া বৃদ্ধ কামাখ্যা বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি ধীর ও গম্ভীর ভাবে কহিলেন "আচ্ছা, আজ একটার পরে এস।" শচীকান্ত চলিয়া গেল। কামাখ্যা বাবুও একটু পরে বাহির হইলেন। তিনি বরাবর শচীকান্তদের বাড়ী গিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন। এবং শচীকান্তের সহিত তাঁহার যে যে কথা হইয়াছিল সমুদয় তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলিয়া কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন "বিষয় দিয়া লাভ কি? দুই দিনেই সব উড়াইবে।"

"আমারও সেই ভয়।" "আচ্ছা, তার হাতে যাতে না যায় তার কোন উপায় নাই?" "কই, না। উইল অনুসারে শচীকান্ত আপনার ত্রিশ হাজার ও আমলার ত্রিশ হাজার এই ষাট হাজার টাকা ছাড়া সব বিষয়ের অধিকারী হইল। আমি তার কাছ থেকে বিষয় রাখি কি করে? আর আজ সে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাহিয়াছে এই টাকা আজই দিতে হবে। এতগুল টাকা দিয়ে তার যে কি দরকার তাত বুঝে উঠ্‌তে পারি না।" "পাঁচ হাজার টাকা! এই টাকা দিয়ে করবে কি?" "কি জানি?" "অপনি কখনও টাকা দেবেন না। দিয়ে কি হবে? জলে ফেলা বইত নয়। ও টাকা আজই উড়াবে।" "না, না, সেটা হঠাৎ করা ঠিক হবে না। তাহ'লে শচীকান্ত আমার উপর ভারি চটে যাবে। আর আমার উপর চটে গেলে আর আমার কোন কথাই শুনবে না। এ অবস্থায় এ কাজটা কি ভাল হবে?" "না, তাহলে ত কোন মতেই হবে না। আপনার উপরেই আমার সব আশা ভরসা। আপনার যা ভাল বিবেচনা হয় করবেন। শচীর সব ভার ত আপনার উপরেই। আপনার কথা না শুনলে ত একবারেই অধঃপাতে যাবে। হায়! হায়! কর্ত্তা যদি এত টাকা না রেখে মরতেন তাহ'লে শচীর এ দশা হ'ত না।" এই বলিয়া অভাগিনী জননী দুঃখে অধীর হইয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার শীর্ণ শরীর ও এই শোক দেখিয়া কামাখ্যা বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি মনে মনে কুলাঙ্গার পুত্রকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

একটার সময় আবার শচীকান্ত দেখা দিল। কামাখ্যা বাবু দেখিয়া অবাক হইলেন যে, শচীকান্ত মদ খাইয়া আসিয়াছে। আধভাঙ্গা স্বরে ও জড়ান কথায় শচীকান্ত কহিল "কই আমার টাকা?" কামাখ্যা বাবু কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন "আজ দিতে পারিব না, কাল তোমার নিলে হয় না কি?" "কি! আমি আজ সকালে বলে যাইনি যে আমার আজই চাই?" "হাঁ বলেছিলে।" "তবে আর কি? আমার যে কথা সেই কাজ। ভাল চাওত এখনি দাও।" এই জ্ঞানহীন পশুর সহিত তর্ক করা বৃথা বুঝিয়া কামাখ্যা বাবু তাহাকে একখানা পাঁচ হাজার টাকার চেক দিলেন আর বলিলেন "দেখ তোমাকে এই টাকা দিতে তোমার কতকগুলি ভাল সুদের কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে হইল।" "তা যাই হোক সে কথা আমি শুনতে চাই না। আর টাকা কড়ির কথা

বলে আমাকে যখন তখন বিরক্ত কর্‌বেন না।” এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সে দিন শচীকান্তের আর দেখা নাই। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল, একে একে এগার, বার, একটা বাজিয়া গেল তবুও তাঁহার উদ্দেশ নাই। এই ঘটনা শচীকান্তের আজ নূতন নহে, প্রতিদিনই এরূপ হয়, সকলে বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, সে কখন বাড়ী আসে কেহ জানে না। আজ তাহা হয় নাই। আজ তাহার মাতা একাকিনী আপন ঘরে বসিয়া আছেন। শচীকান্ত পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে, সে টাকা দিয়া কি করিল, তাহা না জানিয়া তিনি শুইতে যাইতে পারিতেছেন না। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। এ সময়ে কেহ ঘরের বাহির হয় না, এই অন্ধকারে এত রাত্রিতে শচীকান্ত গেল কোথায়? শচীকান্তের অভাব কিসের? রাজ অট্টালিকার মত বাড়ী, কোন জিনিসের অপ্রতুল নাই। আজ্ঞামত সকলই প্রস্তুত। এ সুখের স্থান ছাড়িয়া গেল কোথায়? গৃহে স্নেহময়ী মাতা, ভগিনী ও সাধ্বী পত্নী। শচীকান্তের গৃহে ত ভালবাসার অভাব নাই। এ সকল অমূল্যধন তুচ্ছ করিয়া এ সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া শচীকান্ত কিসের জন্য এই রাত্রিতে কোথায় ফিরিতেছে? এই সকল ভাবনায় মায়ের প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, দুই চক্ষের জলধারার বিরাম নাই। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া ক্ষীণ হাতের উপর মাথা রাখিয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলেন।

হা শচীকান্ত, হতভাগ্য যুবক। পাপের পথ হইতে ফিরিয়া আইস। জননীর প্রাণে যে কি বিষম শেল বিঁধিতেছে, একবার তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও। শিশুকালের মত আবার তাঁহার স্নেহের কোলে আশ্রয় লও। এখনও ফিরিয়া আইস, মায়ের স্নেহময় কোলে এখনও তোমার স্থান আছে। হা দুর্ভাগ্য সন্তান, এ সুখের স্থান, এ আরামের জায়গা, ফেলিয়া কোন্ নরকে যাইতেছ?

রাত্রি প্রায় দুইটা, এমন সময় হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হইল, পরে জুতার শব্দ। শব্দ শুনিয়া শচীকান্তের মাতার হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলেন সে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে ধীরে তাহার ঘরের দিকে গেলেন। দেখিলেন সে টলিতে টলিতে আসিতেছে, অমনি দুই হাতে তাহাকে ধরিলেন, আর কহিলেন “শচীকান্ত, আজ তোমার এত দেরী হইল কেন?” মাতার স্বর কোমল ও স্নেহপূর্ণ। শচীকান্ত মাতাকে ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। পরে আবার তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন “আমার ঘরে চল কথা আছে।” শচীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল। তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসাইয়া তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন “দেখ শচীকান্ত, তুমি এখন বড় হইয়াছ। তোমার এখন আপনি বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করিবার বয়স হইয়াছে। তোমার কোন কাজে হাত দেওয়া আমার আর সময় নাই, তবুও আমি তোমার মা, আমি যেমন পৃথিবীতে তোমার কল্যান ভাবিব এমন আর কেহ পারিবে না, তাই জিজ্ঞাসা করি আজকার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কর্‌লে কি?” শচীকান্ত ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল “দেখ মা, তুমি যে আমাকে এমন করে কথা জিজ্ঞাসা কর এটা আমি ভালবাসি না। আমি টাকা খরচ কর্‌তে জানি, সে টাকা আমি ভাল করেই খরচ করেছি।” “তাহ’লে আর আমাকে বল্‌তে আপত্তি কি?” “আপত্তি ঢের আছে। আমার খুসী, আমি তোমায় বল্‌ব না। মেয়ে মানুষ তুমি, তুমি টাকা কড়ি বিষয় আশ-

যের কথা বোঝ কি? তোমারা খাবে, পর্‌বে, থাক্‌বে, তোমাদের এসব কথা নিয়ে মাথাব্যাথা কেন? সব সইতে পারি, কিন্তু মেয়ে মানুষ যে তিন ঘণ্টা দাঁড়াইয়ে লম্বা লেক্‌চার ঝাড়্‌বে সেটা আদবে সহ্য হয় না" এইরূপ কটূক্তি করিয়া পাপী কুলাঙ্গার সন্তান মাতাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দুঃখে অপমানে লজ্জায় দুঃখিনী বিধবা ভূমিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মার অতুল স্নেহের প্রতিদান এই।

ক্রমশঃ



নাগা জাতি।

(২২ পৃষ্ঠার পর।)

তোমরা গত মাসের সখাতে পড়িয়াছ যে, নাগাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ প্রায় হইয়া থাকে, দুই এক মাস হয়ত বেশ শান্তিতে যাইতেছে কিন্তু তৃতীয় মাসে যে কি হইবে কেহ তাহা বলিতে পারে না। এরূপ যেখানকার অবস্থা সেখানকার লোককে কাযেই খুব সতর্ক থাকিতে হয়, বাস্তবিক নাগাদের গ্রাম এবং পল্লি গুলি যেরূপ ভাবে স্থাপিত এবং গঠিত তাহা দেখিলেই এই জাতির সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক একটী গ্রাম এক একটী দুর্গ বলিলেই হয়। অবশ্য এসকল দুর্গ ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জ* কিম্বা ফোর্ট উইলিয়ম প্রভৃতি ইংরেজদিগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত নয়। আর তা হইবেই বা কেমন করিয়া, কোথায় প্রভূত পরাক্রমশালী সুসভ্য ইংরেজ আর কোথায় বর্ব্বর নাগা জাতি। ভাল, তা না হউক কিন্তু উদ্দেশ্য এক। যাহাতে সহজে গ্রামের মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে ইহারা গ্রামের চারিদিকে বড় বড় শাল কাঠ পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড়া দেয় এবং গড়খাই (পরিখা) কাটে, কোন কোন গ্রামের চারিদিকে আবার দস্তুর মত পাথরের দেয়াল আছে, যুদ্ধের সময় গ্রামের মধ্য হইতে বিপক্ষদলের প্রতি অস্ত্র চালনের সুবিধার নিমিত্ত ঐ সকল বেড়া এবং দেয়ালের গায়ে স্থানে স্থানে ছিদ্র করা আছে। এই ত গেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যখন যুদ্ধ বাধে তখন ইহারা গ্রাম রক্ষার নিমিত্ত আরও বিশেষ বন্দোবস্ত করে, এই সময়ে পাহাড়ের ঢালে এবং পথে ঘাটে নানা প্রকার বিপদজনক ফাঁদ পাতিয়া রাখে, এই সকল ফাঁদে পড়িলে মৃত্যু না হউক মানুষকে বিলক্ষণ জখম হইতে হয়। যে সকল পথ দিয়া শত্রু উঠিবার সম্ভব সেই সকল পথে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাঁসের সুতীক্ষ্ণ সলাকা সকল পুঁতিয়া যাহাতে হঠাৎ কেহ না জানিতে পারে এই নিমিত্ত পাতা, ঘাস, এবং মাটি দিয়া গর্ত্তের মুখ ঢাকিয়া রাখে। সহজেইত নাগাদিগের গ্রামে প্রবেশ করা কঠিন, কারণ গ্রাম গুলি পাহাড়ের উপরে, আবার পথ ঘাট এমনি অপ্রশস্ত এবং আঁকা-

*মাদ্রাজ সহরে ইংরেজদিগের যে কেল্লা (দুর্গ) আছে তাহার নাম "ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জ"। কলিকাতার কেল্লার নাম "ফোর্ট উইলিয়ম"

বাকা যে দুইজনের পাশাপাশি চলিবার যো নাই, গ্রামে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দুয়ার, ইহার উপর যুদ্ধ বাধিলে ঐ রূপ নানা প্রকার ফাঁদ পাতা হয় এবং প্রবেশ দ্বারে দিন রাত্রি প্রহরী থাকে।

এক এক গ্রামে প্রায় চারি পাঁচ শত নাগার সুন্দর পাগীর পালক, হরিণের সিং, বাঘ ছাল, এবং কখন কখন নরকপাল এই সজ্জার উপকরণ। গৃহস্বামীর অবস্থা এবং রুচি অনুসারে প্রত্যেক ঘর দুই কিম্বা তিন অংশে বিভক্ত, ঘরের আসবাবের মধ্যে ধান, চাউল প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া



বাস, নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রামেও অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট ঘর লোক আছে। ঘর গুলি পাহাড়ের ঢালে এমন এক ধরণে নির্ম্মিত যে এরূপ আকারের ঘর অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। ঘরের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার সম্মুখ পাহাড়ের দিকে এবং এদিক খুব উঁচু, পশ্চাৎ এবং দুই পার্শ্ব নীচু, এমন কি প্রায় মাটিতে ঠেকিয়াছে। নাগা পাহাড় অঞ্চলে প্রায় মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বৃষ্টি হয়, কিন্তু ঘর গুলি এই আকারের বলিয়া ঝড় ও বৃষ্টির বেগ বড় একটা লাগে না। ঘর গুলির সম্মুখদিক দেখিতে খুব জমকাল, এবং সুসজ্জিত, মনে রেখ নাগা রুচি অনুসারে সুসজ্জিত, নানা রঙ্গের সুন্দর বাধিবার নিমিত্ত বাঁসের বড় বড় ঠেস, এই সকল ঠেস প্রস্তুত করিতে ইহারা অনেক পরিশ্রম এবং সময় ব্যয় করে; রান্না, আহার, শয়ন ঘরের আর এক অংশে হয়, অস্ত্র সস্ত্র সকলও এই খানে থাকে, প্রত্যেক ঘরেই এক একটী ক্ষুদ্র ভাঁটখানা আছে, নাগারা অতিশয় সুরাপায়ী, আহার করিবার অন্য কিছু থাক আর না থাক সুরা চাই। ঘরের অতি নিকটেই গৃহপালিত পশু পক্ষী রাখিবার স্থান; যাহারা অপেক্ষাকৃত গরিব তাহারা ঘরের মধ্যেই রাখে। কোন কোন গ্রামে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগের ঘরের চারিদিকেই পাথরের পাঁচীল।

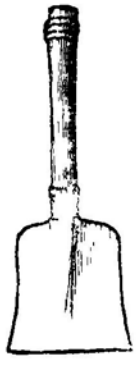
গ্রামের অতি নিকটে, কখন কখন বাস গৃহের

চারি পাঁচ হাত মাত্র অন্তরে মৃতদেহ গোর দেয়, গোরের উপরে নানা আকৃতির মাটির স্তম্ভ প্রস্তুত করে। মৃত ব্যক্তির যুদ্ধের সরঞ্জাম যা কিছু থাকে, তাহা তাহার সঙ্গেই গোর দেয়, কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি গোরের উপর এক খানি কাঠ কিম্বা একখানি পাথরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। মৃত ব্যক্তির যদি জন্ম এক গ্রামে এবং আর এক গ্রামে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহাকে দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গোর দেওয়া হয়, ইহার অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যেন দুই গ্রামেই ইচ্ছামত বেড়াইতে পারে। জীবিত ব্যক্তির সম্মানের নিমিত্তও নাগারা কখন কখন প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বৃহৎ এক খণ্ড পাথর মাটিতে পুঁতিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া নৃত্য গীত করে, সুরাপানে মত্ত হইয়া অঙ্গে নানা প্রকার রং মাখিয়া ঐ পাথরকে বেষ্টন করিয়া করিয়া যখন নৃত্য করে তখন দেখিতে অতি চমৎকার। গ্রামের কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব এবং নিপুণতার পরিচয় দেয়, কিম্বা অন্য কোন প্রকার জনসাধারণের হিতকর কার্য্য করে তাহা হইলে তাহার সম্মানার্থ এইরূপ স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। নাগারা ভক্তি এবং ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপও কখন কখন এইরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি পুত্র সন্তানদিগের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়, কনিষ্ঠ পুত্র এই সমান অংশ ভিন্ন ঘর এক খানিও পাইয়া থাকে, গৃহস্বামীর পত্নী এবং কন্যারা সম্পত্তির অধিকারিণী হন না, মাতার এবং ভগ্নীগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত পুত্রেরা দায়ী থাকে। এবং এই দায়িত্ব তাহারা উচিত মত প্রতিপালন করে। বল্লম এবং দা নাগাদিগের প্রধান অস্ত্র, সম্প্রতি আঙ্গামী নাগারা পিস্তল এবং বন্দুক ব্যবহার করিতে বেশ শিখিয়াছে, এখন বন্দুকে তাহাদের এত সখ যে একটী বন্দুক পাইবার নিমিত্ত এমন কোন জিনিষ নাই যা ইহারা না দিতে পারে; অন্য কোন উপায়ে যদি না পায় তাহা হইলে সুবিধা পাইলেই বন্দুক, গুলি, বারুদ চুরি করে, চুরি করা ইহাদের নিকট একটা বাহাদুরীর কায। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাগারা পাহাড় হইতে নামিয়া নিকটবর্ত্তী চা-বাগানে এবং গ্রামে ও বাজারে বড় উৎপাৎ করিত, এখন কিন্তু অনেকটা শান্ত হইয়াছে, এবং আঙ্গামী প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায় নাগা সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের কৌশলে এবং সুশাসনে উপকৃত এবং উন্নত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনকয়েক আঙ্গামী এবং লোটা নাগা কলিকাতায় আসিয়াছিল, ইহারা রেলগাড়ি, জাহাজ, কেল্লা, প্রদর্শনী মেলা, বড়বাজার, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিল তা আর কি বলিব, অন্ততঃ এই কয়েক জন নাগার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ইংরেজেরা নাগাজাতি অপেক্ষা অনেক পরাক্রমশালী এবং ভাল, ইহাদের সহিত শত্রুতা না করিয়া বন্ধুতা করাই উচিত। যাহা বলিতেছিলাম, বল্লমগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর, কত প্রকার পাখীর পালক, পশুর লোম দ্বারা সুসজ্জিত। বানফারা প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায় নাগারা বল্লম অপেক্ষা দা বেশী ব্যবহার করে, এই দা অতি ভয়ানক জিনিষ, প্রায় দুই কি আড়াই ফুট লম্বা আর চারি কি পাঁচ ইঞ্চ চৌড়া এবং অতিশয় ধারাল। আত্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধের সময় নাগারা ঢাল ব্যবহার করে কিন্তু তোমরা সচরাচর যে ঢাল দেখিয়া থাক এ ঢাল নয়, এ ঢাল বাঁশের এবং দেখিতে ঠিক ঘাট একখানি বাঁশের মত [illegible]

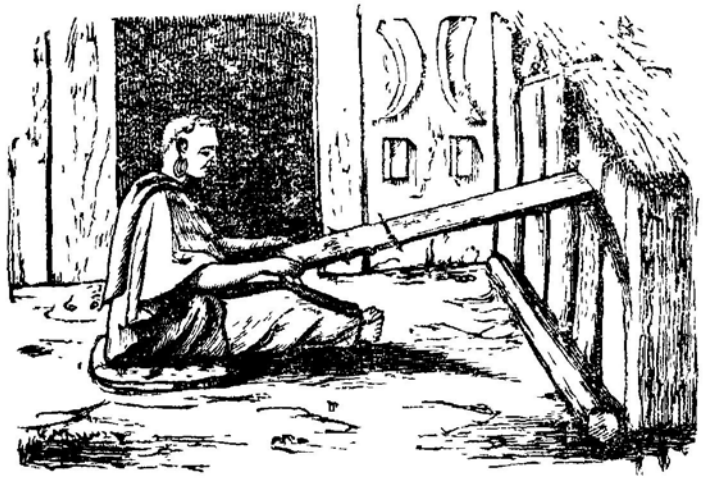
২১ পৃষ্ঠার প্রথম চিত্রটী দেখ) বল্লমের ন্যায় ঢাল ও নানা প্রকার পাখীর পালক, পশুর লোমে সজ্জিত।

জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত নাগারা নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করে, স্ত্রীলোকেরা চাসের যথেষ্ট সাহায্য করে, এমন কি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জমি প্রস্তুত ভিন্ন চাসের আর সমস্ত ভার স্ত্রীলোকদিগের উপর—যুদ্ধ করা এবং সুরা পান পুরুষদিগের প্রধান কায। চাসের অস্ত্রের মধ্যে দা এবং খুরপি প্রধান, তবে সে খুরপি এদেশের খুরপি অপেক্ষা বড় এবং ধারাল। আহার এবং ব্যবসায়ের নিমিত্ত ইহারা গরু, ছাগল, শূকর, কুকুর, মুরগি প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী পালন করে। গো জাতির উন্নতি বিষয়ে নাগারা এত তৎপর যে, দেখিলে আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হয়, এবং এই কারণে নাগা পাহাড়ে যেরূপ সুন্দর সুন্দর বলিষ্ঠকায গরু বাছুর দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ আসামের অন্য কোন স্থানে কিম্বা বাঙ্গালা প্রদেশে দেখা যায় না।



আহার এবং ব্যবসায়ের উপযোগী পশু পক্ষীর তালিকার মধ্যে কুকুরের নাম দেখিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবে ইহারা বুঝি ইংরেজদিগের মত বড় কুকুর ভক্ত, না, তা নয়, নাগাদের নিকট কুকুর অতিশয় উপাদেয় খাদ্য এবং পীড়া বিশেষে সুপথ্য। কি চমৎকার রুচি। আধ পোড়া কুকুর অতি উপাদেয় খাদ্য, এদিকে দুধের গন্ধ ইহাদের নাকে সহ্য হয় না। রুচি চমৎকারই বটে। হয় সিদ্ধ কিম্বা আধ পোড়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকার রান্নার প্রণালী ইহারা জানে না। নাগারা সর্ব্বভুক, এমন প্রাণী নাই যা ইহারা না খায়। টিক্‌টিকি, বিছে, বেঙ্গ প্রভৃতিরাও নাগাদিগের প্রশস্ত উদরে স্থান পায়।

নাগাদিগের বিশেষতঃ আঙ্গামীদিগের পরিচ্ছদ যেমন বিচিত্র এবং জমকাল তেমন আর কোন জাতির আছেকি না সন্দেহ; কিন্তু এ পরিচ্ছদ এবং ইহার উজ্জ্বল দৃশ্য যে কি তাহা না দেখিলে বুঝিয়া উঠা কঠিন। নানা রঙ্গের নানা সাজে সাজিয়া রণবেশ ধরিয়া, রণমদে মাতিয়া সদর্পে নাগাবীর যখন রণে ধাবিত হয় এবং দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে মনের উল্লাসে ঘন ঘন চীৎকার ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া শত শত নাগাবীরের চীৎকারের সঙ্গে মিলিত হইয়া যখন আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তোলে তখন যে কি ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহা সেই দৃশ্য না দেখিলে সেই চীৎকার না শুনিলে বুঝিবার যো নাই। রণ সজ্জায় সাজাইলে ইহাদিগকে যে কি ভীষণ দেখায় চিত্র দেখিয়া কতকটা বুঝিতে পারিবে বটে, কিন্তু প্রকৃত রণ বেশধারী নাগাবীরকে না দেখিলে রণনা বল, আর চিত্র বল কিছুতেই তাহাদের সেই ভয়ানক ভাব, পরিচ্ছদের বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণ এবং তাহার বিন্যাসের কেতা দেখাইবার যো নাই। যুদ্ধ ভিন্ন বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষেও ইহারা এই জমকাল পোষাক পরিয়া থাকে। এত গেল যুদ্ধ এবং উৎসবের সাজ, সচরাচর ইহারা কেবল একখানি গাঢ় নীল কিম্বা কাল রঙ্গের ছোট ধুতি কোমরে জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা শরীরের কতক অংশ ঢাকিয়া গলা বেড় দিয়া পরে বলিয়া তাহাদের সাড়ী গুলি অপেক্ষাকৃত বেশী লম্বা। (গত মাসের সখার ২২ পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখ) এই সকল ধুতি এবং সাড়ী নাগারা নিজে নিজেই বোনে এই সকল



ধুতি এবং সাড়ীতে ইহাদিগের রুচি এবং ক্ষমতা অনুসারে নানা প্রকার নক্সা কাটে, বস্তুতঃ কি কাপড়, কি ঘর, কি অলঙ্কার, নাগাদের তৈয়ারি দ্রব্য সকল দেখিলে ইহাদের শিল্প চাতুরির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ভাল বাসে, তবে নাগা স্ত্রীলোক অপেক্ষা নাগা পুরুষেরা দেহ সজ্জা লইয়া কিছু বেশী ব্যস্ত। ইহারা হাতী এবং শূকরের দাঁত, শঙ্খ, পাখীর পালক, বাঘের নখ প্রভৃতির নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করে। শরীরের এমন স্থান নাই যেখানে কিছু না কিছু একখান না পরে, পৃষ্ঠে—গলার



নীচে—পৃষ্ঠ মালা, কর্ণে শূকরের দন্ত নির্ম্মিত দুল, এই দুলে আবার কতকগুলি ভালুকের লোম চামরের মত বাঁধা, বাহুতে হাতীর দাঁত, হাতে পায়ে শঙ্খ শঙ্খ বেতের অলঙ্কার।



ধর্ম্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে নাগাদিগের জ্ঞান অন্ধকারময়। কোন কোন লোকের এরূপ বিশ্বাস যে যদি তাহারা এ জন্মে সৎকার্য্য করে এবং কোন প্রকার অখাদ্য না খায় তাহা হইলে পরকালে তাহাদের আত্মারা আকাশে নক্ষত্র হইবে, কিন্তু এজন্মে ইহার বিপরীত আচরণ করিলে সাত জন্মের পর মৌমাছি হইবে। অনেকে আবার পরকাল যে কি তাই জানে না, এ সম্বন্ধে কখন চিন্তাও করে না, মৃত্যুর পর শরীর

মাটির তলে পচিয়া যায় কেবল এই মাত্র জানে। শারীরিক অমঙ্গলের ভয় ইহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল, এবং এই ভয় হইতে নানা প্রকার উপ-দেবতার পূজা ও বন্দনা করিয়া থাকে। নাগারা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, মেঘগর্জ্জন এবং ভূমি কম্প প্রভৃতিকে ভৌতিক কাণ্ড মনে করে। নদ, নদী, পর্ব্বতের গুহা গভীর বন ইত্যাদিতে ভূত প্রেত বাস করে বলিয়া বিশ্বাস করে। নিত্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শুভাশুভ ফল জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, যুদ্ধে যাইতেছে এমন সময় সম্মুখ দিয়া যদি একটি হরিণ চলিয়া যায় তাহা হইলে ফিরিয়া আইসে, ইহা অমঙ্গলের চিহ্ন, সম্মুখে বাঘ ডাকা, মঙ্গলের, আর পশ্চাতে অমঙ্গলের চিহ্ন। এই রূপ কত প্রকার কুসংস্কার আছে তা আর কি বলিব।

নাগাদের অনেক দোষ আছে, ইহারা চুরি করে, লুঠ পাট করে, অতি সামান্য কারণে কাটা কাটি করে, ইহারা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ কিন্তু এ সকল দোষ সত্ত্বেও ইহারা সত্য পালনে রত। ইহাদের মধ্যে সপথ করিবার অনেক প্রকার আশ্চর্য্য প্রণালী আছে, তাহার মধ্যে একটি এই; দুই কি তিন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাহারা হয় একটি কুকুর কিম্বা একটি মুরগী ধরিয়া ধারাল অস্ত্র দ্বারা তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলে, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ব্যক্তি এই সত্য পালন না করিবে তাহার দশাও এই হইবে। আর এক প্রণালী এই, এক ব্যক্তিকে কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইলে সে হয় বন্দুক কিম্বা বল্লম, না হয় বাঘের দাঁত স্পর্শ করিয়া শপথ করে যে, যদি সে সত্য পালন না করে তাহা হইলে এই সকল অস্ত্রের দ্বারা যেন তাহার পতন হয়, এইরূপ আরও কত প্রকার আছে।

বসন্ত।

আবার বরষপরে এসেছে বসন্ত অই
শীতের প্রভাবে যারা
ভেবে ভেবে হ'য়ে সারা
বিষাদে মলিন ছিল, শীর্ণ ছিল কলেবর,
জেগেছে আবার তারা দুখের হয়েছে ভোর।

২

পাতাশূন্য ফুলশূন্য শাখা মাত্র করি সার
কতই আকুল প্রাণে
বসন্তের পথ পানে
চেয়েছিল বৃক্ষগুলি; পাখীরা গেছিল চ'লে
ব্যথিত অন্তর লতা লুটিছিল ধরাতলে।

৩

এসেছে বসন্ত পুনঃ জেগেছে সকলে তারা,
পাখীরা এসেছে সবে
গাইতে মধুর রবে;
মলয় বহিছে লয়ে আনন্দের সমাচার
স্বরগ পৃথিবী এবে হইয়াছে একাকার।

৪

চাঁদের ধরে না হাসি থাকিয়া আকাশ গায়
ছোট ছোট তারাগুলি
তারাও নয়ন খুলি
মিটি মিটি মৃদু হাসে আনন্দে পরাণ ভরি
সুনীল অম্বরে যেন উজ্জ্বল মুকুতা সারি।

৫

মনে হয় এই হাসি পাখীর আনন্দ গান
কোন দিন না ফুরাবে,
এমনি কাটিয়া যাবে,
সারাটী বরষ ভরে আনন্দের কোলাহল
আসিবে না গ্রীষ্মতাপ বরষার ঘোর জল।

৬

কিন্তু হায়। সমভাবে নাহি যায় চিরকাল,
গ্রীষ্ম বর্ষা পূর্ব্বভাবে
আসিবে আবার যাবে,
পুনরায় সেই শীত, ফুরাবে পাখীর গান,
শুকায়ে পড়িবে পাতা লতা পুন হবে ম্লান।



বীরত্ব।

এপর্য্যন্ত সখায় অনেকগুলি বড় বড় লোকের এবং মহিলাদিগের জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মুখের উপদেশ অপেক্ষা কার্য্যের দৃষ্টান্তে অনেক ফল হয়, এই জন্য জীবন চরিতের এত আদর। সখার পাঠক পাঠিকারা, বড় বড় লোকের এবং মহিলাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন, যাহাতে এই সকল মহৎজীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের হৃদয়ে মহৎ ইচ্ছা সকল অঙ্কুরিত হয়, সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং নিজ নিজ জীবন সৎপথে রাখিবার সংকল্প উদিত হয়, সেই জন্যই এই সকল জীবন-চরিত সখায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। হয়ত এই সকল মহৎজীবনের ঘটনাগুলি পড়িয়া আমাদিগের অনেক পাঠক পাঠিকার মনে অনেক সৎ ইচ্ছা উদিত হয়, সৎ এবং মহৎ কার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। কিন্তু অনেকে হয়ত নিজের অবস্থার উপর দোষ চাপাইয়া বসিয়া থাকেন, বলেন এত বড় মহৎ কার্য্য কি আমাদের মত অবস্থার লোকের দ্বারা কখনও হইতে পারে? কেহ বা নিজ অদৃষ্টকে দোষী করেন, বলেন এত বড় বড় কাজ করা কি আমাদের অদৃষ্টে সম্ভব। যাঁহারা এই প্রকার বলেন, তাঁহারা যদি প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পান যে, তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সৎকাজ হইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা সে কথা বলিতেছি না। আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের এই প্রকার সৎকাজ করিবার ইচ্ছা খুব অধিক, মহৎ কার্য্যের জন্য যাহারা বড় ব্যগ্র, বড় বড় কাজ করিয়া বীর বলিয়া পরিচিত হইবার যাঁহাদিগের বাসনা বড় প্রবল, তাঁহাদিগকে আজ আমরা বড় লোক হইবার একটী সহজ পথ দেখাইয়া দিব। এ পথে চলা কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না, অথচ যিনি চলিতে পারিবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই লোকে বীর বলিয়া প্রশংসা করিবে।

এই বীরত্বের জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না, দেশ বিদেশে যাইতে হইবে না। নিজ নিজ

গৃহ, নিজ নিজ পরিবার এবং নিজের প্রতিদিনের কার্য্যের মধ্যেই এই বীরত্ব দেখাইবার স্থান। আমরা ক্রমে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যে এই বীরত্ব প্রথমে ছোট খাট কার্য্যে দেখাইতে পারে, সেই পরে বড় বড় কার্য্যে বীরত্ব দেখাইতে সমর্থ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যে বীর নয়, সে কখনও একটা মহৎ কার্য্য করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

একটি পুরাতন গল্প বলি। বালক থিমোডোর পার্কার যখন কৃষিক্ষেত্র হইতে কাজ করিয়া বাড়িতে ফিরিতেছিলেন, তখন পথের ধারে জলাশয়ে একটি কচ্ছপ দেখিয়া তাহাকে মারিবার জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র লাঠি উঠাইলেন, কিন্তু মারিতে উদ্যত হইয়াই তাঁহার মনে হইল যে, এ অন্যায় কাজ করা হইতেছে—পার্কার অমনি বিরত হইলেন; এই খানে পার্কারের বীরত্ব। কচ্ছপটাকে মারিয়া পার্কার একটু নিষ্ঠুর আমোদ পাইতেন বটে, কিন্তু তেমনি একটি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করা হইত। পার্কার অন্যায় কার্য্য করিয়া এই নিষ্ঠুর আমোদ পাইতে ইচ্ছা করিলেন না। বালকেরা কুকুর বিড়াল পাখী প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে যন্ত্রণা দিয়া এক প্রকার আমোদ অনুভব করে। পার্কার যখনই বুঝিলেন, অন্যকে কষ্ট দিয়া আমোদ অনুভব করা অতি গর্হিত কার্য্য, তখনই তাহা হইতে বিরত হইলেন, এই বীরত্ব। বালক পার্কার অন্যকে যন্ত্রণা দিয়া নিজে সুখ অনুভব করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তাই পরে তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি যে, পার্কার অসহায় দাসদিগের বন্ধু হইয়া, তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিয়াছিলেন।

যাহা কর্ত্তব্য বুঝিবে তাহা যে করিতে পারে সেই বীর। অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন পম্পীয়াই নগর বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন এক জন সামান্য সৈনিক কি বীরত্ব দেখাইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেই জান। এই সৈনিক পাহারা দিতেছিল, এমন সময় সেই ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাৎ আরম্ভ হইল, সকলেই প্রাণ ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু এই সৈনিক তাহার স্থান হইতে একপদও সরিল না,—সে জানিত প্রাণ গেলেও তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে। ক্রমে সমস্ত নগর সেই অগ্নি ও ভস্মে ডুবিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই সৈনিকও অগ্নি ও ভস্মস্তূপের মধ্যে প্রাণ হারাইল। এই খানে বীরত্ব। সেই সৈনিক জানিত যে তখন সে যদি পলায়ন করে তাহা হইলে কেহই তাহাকে বাধা দিবে না, এবং কেহ কিছু বলিবেও না বা শাস্তি দিবে না। কিন্তু তথাপিও সে তাহার স্থান পরিত্যাগ করিল না। কেহ কিছু বলুক আর না বলুক, সে তাহার কর্ত্তব্য হইতে কেন ভ্রষ্ট হইবে? সেই সৈনিক নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া জীবন হারাইয়াছে, কিন্তু আঠার শত বৎসর পরেও আজ আমরা তাহার যশ, কীর্ত্তন করিতেছি।

এ সকল দৃষ্টান্তও আমরা ছাড়িয়া দি। ছেলেবেলায় একখানি ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, দুইটি বালক একদিন বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিল; তাহারা দুই সহোদর। বেড়াইতে গিয়া তাহারা বনের মধ্যে পথ ভুলিয়া যায় এবং ক্রমে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন আর উপায় না দেখিয়া বনেই রাত্রি কাটাইবে স্থির করে। ছোট ভাইটি, "দাদা বড় শীত করিতেছে" বলিয়া যখন কাঁদিতে লাগিল, তখন বড় ভাই তাহার

নিজের গায়ের কাপড় খুলিয়া ছোট ভাইটির গায়ে দিয়া দিল, ছোট ভাইটী তবুও আবার যখন "বড় শীত করিতেছে" বলিয়া কাঁপিতে লাগিল, তখন বড় ভাই আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, ছোট ভাইটীর গায়ের উপর শুইয়া রহিল, তাহাতে কতক শীত নিবারণ হইল। সে শীতপ্রধান দেশ, রাত্রিতে বরফ পড়িয়া থাকে, প্রাতঃকালে সকলে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে আসিয়া দেখিল উভয়েই মৃত। এই খানে আবার বীরত্ব দেখ। ছোট ভাইটীকে শীত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বড় ভাই নিজের বস্ত্র খুলিয়া দিল, সেই দারুণ শীত এবং নিজে অকাতরে সহ্য করিতে লাগিল। সে জানিত ইহাতে তাহার প্রাণ যাইবে, কিন্তু ছোট ভাইটীর যাহাতে কষ্ট না হয়, সে যাহাতে বাঁচে এই তাহার চিন্তা; সে নিজের জীবনের দিকে চাহিল না। এইই বীরত্ব। বিপদে পড়িলে কি তোমরা ছোট ভাই বোনের জন্য এতদূর করিতে পার? যদি তাহা না পার, তবে তোমরা কোন কালে বীর হইতে পারিবে না। নিজের ছোট ভাই বোনের জন্য যদি নিজের প্রাণ না দিতে পার, তবে বড় বড় কাজের আশা তোমরা কেমন করিয়া করিবে? আগে ভাই বোনের জন্য নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে শিখিবে, তবে দেশের জন্য কাজ করিতে পারিবে।

গত বৎসরের সখায় তোমরা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবনী পড়িয়াছ, তাহাতে তোমরা তাঁহার অসামান্য সাধুতা দেখিয়াছ। তোমরা জান তাঁহার পিতার অনেক ঋণ ছিল; মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর সে ঋণ পরিশোধ না করিলে আইনতঃ তিনি একটুও দায়ী হইতেন না। কিন্তু তিনি আইনের পরামর্শ শুনিলেন না, লোকের বা আত্মীয় স্বজনদিগের পরামর্শও শুনিলেন না। যাঁহারা টাকা পাইবেন তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত জমিদারীর একটা তালিকা করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে দিলেন। তিনি জানিতেন ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে, এই সমস্ত জমিদারীই বিক্রয় হইয়া যাইবে, তাঁহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা টাকা পাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতারণা করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যুও তিনি শ্রেয় মনে করিলেন। উত্তমর্ণেরা তাঁহার এই অসাধারণ সাধু ব্যবহারে অবাক্ হইয়া গেল, দেশের লোক চমৎকৃত হইল। এই খানে বীরত্ব। মহর্ষি ইচ্ছা করিলেই এই অগাধ ঋণ পরিশোধ না করিতে পারিতেন। পথের ভিখারী হইতে হইলেও সাধুতা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, তোমরা কি তোমাদের প্রতিদিনের কার্য্যে একথাটী মনে রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাক? অন্যকে ঠকাইয়া একটী সামান্য জিনিষ লইতে পারিলেও আমরা তাহা ছাড়ি না। যদি বীর হইতে চাও তবে ইহা মনে রাখিও যে, পথের ভিখারী হইতে হইলেও সাধুতা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, অন্যকে প্রতারণা করা উচিত নয়। একটী অন্যায় কাজ করিয়া তাহা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা বলিও না। হয়ত মনে হইবে একটী সামান্য "না" বলিলে আর কি হইবে। কিন্তু এই একটী "না" সর্ব্বনাশের মূল। ইহা নিতান্তই কাপুরুষতার লক্ষণ। অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহার জন্য যদি শাস্তি পাইতে হয়, অপদস্থ হইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবুও গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না। যে শাস্তি পাইবার বা অপদস্থ হইবার ভয়েও মিথ্যা কথা না বলে, সেই বীর। কত ছোট খাট বিষয়ে তোমরা বীরত্ব দেখাইতে পার, আবার কত ছোট খাট বিষয়েই আমার কাপুরুষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অমরা দেখিয়াছি একটী বালকের হাতে যদি চারিটী কমলা লেবু দেওয়া যায়, আর বলা যায় যে তোমরা চার ভাই বোনে ভাগ করিয়া লও। তাহা হইলে যেটী সকলের অপেক্ষা বড, বালকটী নিজের জন্য সেইটী রাখিয়া, আর তিনটী তিন জনকে দিবে। ইহাই কাপুরুষত্ব। এই সামান্য বিষয়েই কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়, আবার ইহাতেই বীরত্ব দেখাইতে পারে। সকলের অপেক্ষা ছোট যেটী সেইটী তুমি নিজের জন্য রাখিয়া, বড় তিনটী ভাই বোনদের যদি দিতে পার, তবেই তুমি বীর। বীরত্বের শিক্ষা ছেলেবেলায় এই ছোট খাট বিষয় লইয়াই হয়। যে ছেলেবেলা হইতে এইটুকু না পারে, এই স্বার্থটুকু ছাড়িতে না পারে, সে বড হইয়া কখনও মহৎ কাজ করিতে পারিবে না। মা খাবার দিয়াছেন, হয়ত আমার বোনকে কি ভাইকে, আমার অপেক্ষা একটু বেশী দিয়াছেন বা তাহাদিগকে আমার চেয়ে বড় সন্দেশটা দিয়াছেন। দেখিয়াই আমার মনে একটু হিংসা হইল—আমাকে কেন বড়টী দেওয়া হইল না। হয়ত আমি মুখে কিছুই বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে আমার বড়ই হিংসা বহিয়া গেল। ইহা ভয়ানক নীচতা এবং ভয়ানক ক্ষুদ্রতা। আমরা এই সকল অতি সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া দিতেছি; পাঠক পাঠিকারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, এই প্রকার সামান্য বিষয়েও আমাদের মধ্যে কত ক্ষুদ্রতা আছে। বড় বড় বিষয়ের ত কথাই নাই। যে বালক এবং যে বালিকা এই নীচতা ও ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিতে পারে,—সেই বীর। আমরা তাহাকেই বীর বলিব। লোক জানাইয়া দশটা ভাল কাজ করিলেই কেবল বড় লোক হওয়া যায় না। এই সকল সামান্য বিষয়েও যে বড় সেই বড়। বীরত্ব, দেখইবার আরও কত সুযোগ, কত স্থান আছে। যে রোগ যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করিতেছে, তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া বীরত্ব দেখাও, তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহার ক্লেশ যন্ত্রণা দূর কর,—তাহা অপেক্ষা বীরত্ব আর নাই। যে দুঃখী কাঙ্গাল, যাহার দিকে কেহ ফিরিয়া চাহিল না, তাহাকে সান্ত্বনা দেও—তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন কর, তাহাকে স্নেহ ভালবাসা দেও, তোমাকে জগতের লোকে বীর বলিবে। যে অনাথ, দিনান্তে যাহার অন্ন জুটে না—দিনান্তেও যে মুষ্টি ভিক্ষা পায় না, অঙ্গে যাহার ছিন্ন বস্ত্রও নাই, তাহাকে অন্নবস্ত্র দেও, মস্তক রাখিবার স্থান দেও, আমরা তোমাকে বীর বলিব। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা বলিও, আমরা তোমাকে বীর বলিব। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে সকলে কঠিন কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু যে সেই কঠিন কথার পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা বলিতে পারে, সেই বীর! সকলে তাহা পারে না, এবং সকলে যাহা না পারে তাহাই বীরত্ব। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা, কঠিন নির্দ্দয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কোমল ও সদয় ব্যবহার বীরত্ব কিনা, তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিও, দেখিবে তাহাতে কতটা হৃদয়ের বীরত্ব দরকার। যে পর বলিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে তুমি আপন বলিয়া তাহার উপকার করিতে যত্নবান হইবে, তোমাকে সংসারের লোকে বীর বলিবে। যে শত্রুতা করিবে তাহাকে ভাইয়ের মত দেখিবে, তোমাকে জগতের লোকে বীর বলিবে। এ বীরত্বের পথ সহজ অথচ কঠিন। হৃদয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে এবীরত্ব বড়ই সহজ—আর ইহাও নিশ্চয় জানিও লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ করিয়া একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য অধিকার করা অপেক্ষা এই বীরত্বের মূল্য অধিক।

ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। তবে পাঠক পাঠিকা তোমরা কি ইহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে না?

(প্রাপ্ত।)

বালকের রচনা।

ক্রোধ।

(সত্য ঘটনা।)

শোহর জেলায় হরিহরপুর গ্রামে, রামচন্দ্র গুপ্ত নামক ১১।১২ বৎসরের একটি বালক ছিল। তাহাকে যে সেই রাগাইতে পারিত, সে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, সকলেই সশঙ্ক থাকিত। রামচন্দ্র হাঁড়ী, কলসী, ঘটী, বাটী ইত্যাদি যে কত ভাঙ্গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। রাগ হইলে তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিত না। তাহার কতদিন উপবাসে গিয়াছে।

একদিন তাহার মাতা কতকগুলি সোনার গহনা জহুরির বাটী হইতে আনিতে বলেন, সে তাহা আনিতেছে। পথে তাহার পায়ে এমন একটি আঘাত লাগিল যে, রক্তপাত হইল। রামচন্দ্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং "এই পোড়া গহনার জ্বালায় মরিলাম" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত গহনা নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। রামচন্দ্র রাগিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। কাহার সাধ্য যে, সাহস করিয়া তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। শেষে রামচন্দ্রের রাগ থামিলে সে নিজে গিয়া সেই পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া গহনা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সকল না পাইয়া, শেষে মাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল যে "কেন তুমি আমাকে গহনা আনিতে পাঠাইলে?"

আর একদিন কোন কর্ম্মের নিমিত্ত এক ঘরে ঢুকিতেছে এমন সময় চৌকাঠে তাহার মাথা লাগিল, কিছু না বলিয়া কর্ম্ম করিয়া বাহিরে আসিতেছে আবার পূর্ব্ববৎ চৌকাঠ মাথায় লাগিল, এবার আর সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার রাগ চৌকাঠের উপর না পড়িয়া মাথার উপর পড়িল, তখন সেই চৌকাঠে মাথা খুঁড়িতে লাগিল এবং "কত লাগিবে লাগ, কত লাগিবে লাগ" বলিয়া মস্তককে তিরস্কার করিতে লাগিল। কপাল কাটিয়া রক্তারক্তি হইতে লাগিল তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই। এই রকম রাগ করিয়া যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয় তাহা বলা যায় না।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। মরণ।

নূতন।

সর্ব্ব জীবে বাস করি সবে মোরে চায়,
আকাশে পর্ব্বতে থাকি; না থাকি কোথায়?
এক মোর নাম কিন্তু দুই ভাবে থাকি,
মাথা কাটি, জন্তুগণে ক্রোড়ে আমি রাখি।
মাঝ খান রেখে চড়ি ঘোড়ার উপরে,
সুবুদ্ধি বালক যেই সেই জানে মোরে।



এপ্রিল, ১৮৮৮।

নববর্ষ।

১

আসিযাছে নববর্ষ
পুরাতন গেছে চলে।
শোভিছে প্রকৃতি দেবী
নব নব ফুল ফলে।

২

পাখীরা গাইছে গান
কেমন মধুর স্বরে
লইযে সুগন্ধি কত
ম।যু বহিছে ধীরে

৩

দেখিযে জুড়ায আঁখি
কিবা শোভা চমৎকার।
কে যেন সাজায়ে ডালা
দিতেছেন উপহার!

৪

কেন পূরিয়াছে ধরা
আনন্দের কোলাহলে?
কেন এত হাসি-ভরা?
পুরাতন গেছে বলে?

৫

কেবলি কি পুরাতন
পরিপূর্ণ শোক দুখে?
নূতন বরষ এলে
সকলি কি ভাসে সুখে?

৬

অতীত বরষে তবে
কিছুই শিখিতে নাই?
নূতন এসেছে বলে
এত কি আনন্দ তাই?

৭

সুখের এ নববর্ষ
চির নব নাহি রয়
কালের প্রবাহে শীঘ্র
হয় পুরাতন ময।

৮

আগমনে এবে যথা
মহা আনন্দিত সবে।
তেমনি বরষ পরে
আনন্দে বিদায দিবে।

৯

নূতনে কি পুরাতনে
কিছুই প্রভেদ নাই
সুখ, দুঃখ, শিক্ষা, জ্ঞান
রযেছে দোহার ঠাঁই।

(১০)

লভিযাছি কত স্নেহ
ভালবাসা পুবাতনে,
স্মৃতিব আলোকে তাহা
উজলিত ববে প্রাণে।

(১১)

দুঃখের অনলে পুড়ি
লভিযাছি যে জ্ঞান
নূতন ববষে কত
সুফল কবিবে দান।

(১২)

যেই দোষে যেই পাপে
কলঙ্কিত ছিল প্রাণ,
নূতনে না করি যেন
সাবধান। সাবধান।

(১৩)

শিক্ষা দেয় পুবাতনে
কব তাবে নমস্কাব।
সম্মুখে নূতনে চাহি।
হও সবে আগুসার।

(১৪)

আশা কব আনন্দেতে
নূতন এসেছে ব'লে।
মনে বেখো পুবাতনে
যদিও সে গেছে চলে।



ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্।



নবপোত-সমাকীর্ণ টেমস্ নদীব তীবে বিস্তীর্ণ পার্লিযামেণ্ট গৃহ। এই মহাসভা গৃহে ইংলণ্ড, স্বট্লণ্ড, আযর্লণ্ড প্রভৃতি দেশেব বাজনৈতিক ও সামাজিক বীতি নীতি সকল আলোচিত এবং নিযন্ত্রিত হইতেছে, শাসনতন্ত্র-প্রণালী বিধিবদ্ধ হইতেছে, এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি স্থিবীকৃত হইতেছে। ইংলণ্ড এবং ইংবাজাধিকৃত দেশ সমূহেব অদৃষ্টলিপি এই মহাসভায় প্রতি মুহূর্ত্তে পবিবর্ত্তিত হইতেছে,—ইংবাজাধিকৃত দেশ সমূহেব অদৃষ্টচক্র এই মহাসভা দ্বাবা প্রতিনিযত পবিচালিত হইতেছে। টেমসের অপর পাবে, এই মহাসভার সম্মুখস্থ আর একটী গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত কব। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার বিস্তীর্ণ অট্টালিকা অপেক্ষা আয়তনে এই গৃহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তাহার সন্দেহ নাই, এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভাগৃহে দেশ শাসন-প্রণালী এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি গুরুতব বিষয় সম্বন্ধে যে সকল মহা আন্দোলন হইয়া থাকে, এখানে তাহা হয় না বটে, কিন্তু মনে হয় যেন এই সকল গুরুতর বিষয় অপেক্ষাও একটী অতি মহত্ত্ব বিষয়ের সাধনা এই গৃহে হইতেছে! পার্লিয়ামেণ্ট শত্রুর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা কবিতেছেন, যুদ্ধে শত লোক প্রাণ হারাইতেছে—সহস্র লোক আহত হইতেছে; নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমে এই সকল আহত নিরাশ্রয় সৈনিকদিগের সেবার জন্য, স্নেহশীলা কোমলহৃদয় পরোপকারব্রতা মহিলাগণ শিক্ষিতা হইতেছেন। পার্লিয়ামেণ্ট যে শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমের



পরোপকারপরায়ণা মহিলাগণের কোমল স্নেহপূর্ণ করস্পর্শে সে শোণিত স্রোত রুদ্ধ হইতেছে। আহত, ক্ষত যন্ত্রণা ভুলিতেছে, রোগী, রোগ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেছে, সংসারে আপনার বলিবার যাহাদের কেহ নাই, তাহারাও মাতার স্নেহ, ভগ্নীর ভালবাসা সেবা ও যত্ন প্রাপ্ত হইতেছে। সংসারে ইহা অপেক্ষা মহত্ত্বর কার্য্য আর কি আছে, আমরা জানি না। এ সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অনেক অধিক, এই দুঃখভার দূর করিবার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারাই ধন্য। অন্যের দুঃখ ক্লেশে যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হয়, অন্যের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য যাঁহাদিগের হস্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত, অসহায় নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করা যাঁহাদিগের প্রকৃতি, রোগে সেবা শোকে সান্ত্বনা দান, যাঁহাদিগের জীবনের ব্রত, এজগতে তাঁহারাই দেবতা। কলনাদিনী টেমসের এক তীরে বিস্তীর্ণ পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ, অপর তীরে সেণ্ট-টমাস হাঁসপাতাল। সেণ্ট-টমাস হাঁসপাতালের বিস্তীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে "নাইটীঙ্গেল্ আশ্রম" স্থাপিত। নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে চল—এক

দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। উপরে যাঁহার চিত্র দেওয়া গিয়াছে, এই দেবী-মূর্ত্তি তাঁহারই। যে মহৎ কার্য্যে ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, ইংরাজ জাতি এই "নাইটীঙ্গেল্ আশ্রম" স্থাপিত করিয়াছেন। যে সকল দুঃখক্লিষ্টা মহিলাগণ আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য, জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, এই নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমে তাঁহাদের শিক্ষা হইতেছে। কিরূপে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, এই স্থানে প্রতিদিন তাঁহারা সে শিক্ষা পাইতেছেন,—আশা একদিন তাঁহারাও এক একটী "নাইটীঙ্গেল্" হইবেন।

ইটালী দেশে ফ্লোরেন্স্ নগরে ১৮২০ সালে নাইটীঙ্গেলের জন্ম হয়। ফ্লোরেন্স্ নগরে জন্মহয় বলিয়া ইঁহার নাম ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল রাখা হয়। ইঁহার পিতার নাম উইলিয়ম সোর নাইটীঙ্গেল্। ইনি একজন প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ডার্বিসায়ারের মধ্যে লি হার্ষ্ট নামক স্থানে ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের বাল্য জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। লি হার্ষ্ট প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। বালিকা নাইটীঙ্গেল্ এই রমণীয় উদ্যানের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, এবং যে মহৎকার্য্যে পরে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই খানেই তাহার প্রথম বিকাশ হইতে লাগিল। অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য বাল্যকাল হইতেই এই বালিকার এক দারুণ তৃষ্ণা ছিল। পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা ইঁহার প্রকৃতিতে এত প্রবল ছিল যে, সেই বাল্য বয়সেই সকলে তাহা লক্ষ্য করিত। যাহার অভাব আছে, কি প্রকারে তাহার অভাব দূর হইবে, যে দুঃখী, কি প্রকারে তাহার দুঃখ মোচন হইবে, যে আশ্রয়-শূন্য, কি প্রকারে সে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে, সেই বাল্য-বয়সেই বালিকাকে এই সকল চিন্তায় আকুল দেখা যাইত। পশু পক্ষী প্রভৃতির উপরেও এই বালিকার অসাধারণ স্নেহ ছিল। এবং যে সকল পক্ষী মানুষের পদশব্দ শুনিবামাত্র উড়িয়া পলায়ন করে, বালিকা নাইটীঙ্গেলের কাছে আসিয়া তাহারা নির্ভয়ে আহার লইয়া যাইত।

ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ বাল্যকালে অশ্বারোহণ করিতে ভাল বাসিতেন। একজন ধর্ম্মযাজকের সহিত নাইটীঙ্গেলের পিতার বন্ধুত্ব ছিল, ইনি সৎলোক ছিলেন এবং অনাথ দরিদ্রদিগের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা ও যত্ন করিতেন। বালিকা মধ্যে মধ্যে ইঁহার সহিত অশ্বারোহণে বাহির হইত। ধর্ম্মযাজক চিকিৎসা শাস্ত্রও কিছু কিছু জানিতেন, অসহায় দরিদ্রদিগকে অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করা ব্যতীত রোগের সময় তাহাদিগকে চিকিৎসাও করিতেন। রোগীর শুশ্রূষা কি প্রকারে করিতে হয়, বালিকার সে শিক্ষা এইখানেই আরম্ভ হয়। নাইটীঙ্গেল্ এই পরদুঃখকাতর বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের সহিত, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া, প্রভূত আনন্দ ও সুখ অনুভব করিতেন। অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ের যে দারুণ তৃষ্ণা, ইহাতে তাহার কতক তৃপ্তি হইত। বালিকা এই ধর্ম্মযাজকের সহিত যখনই দরিদ্রদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য বাহির হইতেন, তখনই একটী ঝুড়ীতে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, দরিদ্রদিগকে বিলাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। এই সকল খাদ্য দ্রব্য অধিকাংশই তিনি নিজের খাবার হইতে বাঁচিয়া দিতেন।

পশুদিগের প্রতিও তাঁহার কি প্রকার দয়া ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। বজার নামক একজন মেষপালকের ক্যাপ্ নামে একটী কুকুর

ছিল, কুকুরটী বড় ভাল, বজারের মেষপাল রক্ষা বিষয়ে অনেক সাহায্য করিত। একদিন একটী দুষ্ট বালক, ইট নিক্ষেপ করিয়া ক্যাপের একখানি পা ভাঙ্গিয়া দেয়। বজার দেখিল ক্যাপের দ্বারা কোন কার্য্যই আর হইবে না; তখন সে তাহাকে মারিয়া ফেলাই শ্রেয় মনে করিল। কিন্তু একথা বালিকা নাইটীঙ্গেল্ জানিতে পারিয়া সেই বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের সহিত বজারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মযাজক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, পা ভগ্ন হয় নাই, কেবল মাত্র আঘাৎ লাগিয়াছে, শীঘ্রই আরাম হইবে। বালিকা নাইটীঙ্গেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিলে ক্যাপ শীঘ্র এ কষ্ট যন্ত্রনা হইতে মুক্তি পায়? ধর্ম্মযাজক বলিলেন, গরম জলের সেক্ দিলে শীঘ্র আরাম হইবার সম্ভাবনা। বালিকা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ আর এক গৃহস্থের গৃহ হইতে একটী ফ্লানেলের পুরাতন জামা আনিয়া, জল গরম করিয়া তাহাদ্বারা ক্যাপের ক্ষতপদে সেক্ দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্যাপ্ অল্প কাল মধ্যেই যন্ত্রণার উপশম বোধ করিল এবং নানাপ্রকারে বালিকা নাইটীঙ্গেল্‌কে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে নাইটীঙ্গেল্ প্রথমেই বজারের গৃহে গেলেন, যাইবার সময় দুইটী ফ্লানেলের জামা লইয়া গেলেন, পূর্ব্বদিন সেক্ দিবার জন্য যাহার জামা লইয়াছিলেন, তাহাকে ঐ দুইটী জামা দিলেন, এবং ক্যাপ অনেক আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া কত সুখী হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাইটীঙ্গেলের পিতা একজন প্রভূত সম্পতিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ যখন বালিকা, তখন বিলাতেও স্ত্রীজাতীর উচ্চশিক্ষা বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু উইলিয়ম সোর নাইটীঙ্গেল্, দেশের লোক অপেক্ষা এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর ছিলেন। ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল পিতার যত্নে, গণিত, লাটীন, গ্রীক প্রভৃতি পুরাতন ভাষা, ইতিহাস, এবং আধুনিক ভাষা সকল বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি গর্ব্বিতা বা অহঙ্কৃতা হন নাই। রমণীহৃদয়ের কোমলগুণ গুলি তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া যায় নাই। বরং স্নেহ, দয়া, পরোপকারের প্রবৃত্তি তাঁহার বয়সের সহিত বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। নাইটীঙ্গেল্ অতি সুমধুর গান করিতে পারিতেন, এবং শিল্পকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল।

নাইটীঙ্গেল্ যত বড় হইতে লাগিলেন, সৎকার্য্যের জন্য তাঁহার পিপাসা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাঁর মাতাও অতিশয় দয়ালু ছিলেন, অনাথ আতুরদিগের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবার জন্য তিনিও যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দানে দরিদ্রদিগের কুটীরে গিয়া তাহাদিগের অভাব মোচনে, অনাথ বালকবালিকা, রোগী এবং বৃদ্ধদিগের সেবা শুশ্রূষায়, তিনি তাঁহার মাতার যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, কিন্তু ইহাতেও যেন তাঁহার দারুণ পিপাসার শান্তি হইত না। নাইটীঙ্গেলের সৎকার্য্যের প্রতি এই ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত, ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীর প্রতিও তাঁহার এক গভীর অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে, এই অনুরাগ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যত তিনি বয়সে বড় হইতে লাগিলেন, ততই যেন অনুভব করিতে লাগিলেন, যে অন্যের সাহায্য করা অন্যের দুঃখ-ক্লেশ মোচনের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই, তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কি উপায়ে ইহা সাধিত হইবে নাইটীঙ্গেল্ তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত সৎ

কার্য্য কি, তাহা তিনি বাল্য বয়সেই পিতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং চক্ষের সমক্ষে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া দিয়াছিলেন,—সেই আদর্শকে স্বীয় জীবনে কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহার আশা ও উদ্দেশ্য।

এই সময়ে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে সময়ে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের হাঁসপাতাল সমূহে বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল না। নাইটীঙ্গেল্ দেখিলেন, রোগীদিগের সেবা কি প্রকারে করিতে হয়, ইহা ভাল না জানাতেই আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। সুতরাং নিজে এই কার্য্য রীতিমত শিক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। এবং ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের হাঁসপাতালগুলি এই জন্য একে একে পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে বয়সে মানুষ ভোগবিলাস ও সুখভোগে মত্ত হয়—যে বয়সে মানুষ আত্মসুখ লইয়া ব্যস্ত হয়, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল সেই তরুণ বয়সেই এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন। রোগীর সেবা, আহতের শুশ্রূষা, অনাথকে আশ্রয় দান, এবং দুঃখীর দুঃখমোচনে যে সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখ তিনি কখনও বুঝেন নাই—জানিতেন না। একে একে দেশীয় এবং বিদেশীয় হাঁসপাতালগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিয়া, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ অবশেষে ফ্রান্সের একটী আশ্রমে কিছুকাল শিক্ষা করিবার জন্য অবস্থান করেন, এই খানেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নাইটীঙ্গেল্ দেশে ফিরিলেন, তাঁহার কার্য্যও আরম্ভ হইল।

নাইটিঙ্গেল্ দেশে ফিরিয়া দেখিলেন, ভদ্রমহিলাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হার্লী ষ্ট্রীটে যে আবাস আছে, তাহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। প্রথমেই তিনি এই স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য স্বীয় শরীর মন অর্পণ করিলেন। দুই তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে এই স্বাস্থ্যাবাসের অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইল। নাইটীঙ্গেল্ আর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্তভাবে দিবানিশি যে অসাধারণ পরিশ্রম করিলেন, অচিরে তাহার শুভফল উৎপন্ন হইল। এই স্বাস্থ্যাবাসের অবস্থা যে কেবল দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল, তাহা নহে, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব বিষয়েও আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য চিন্তা, ও এই দুই তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নাইটীঙ্গেলের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুদিন বিশ্রামের জন্য গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ যখন হার্লী ষ্ট্রীটের স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন, তখন ইংলণ্ডে এবং সমস্ত ইউরোপে এক ভীষণ বিপ্লবের আয়োজন হইতেছিল। বিখ্যাত ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর অশান্তির অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সমস্ত ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আটত্রিশ বৎসর পরে সেই নির্ব্বাপিত অশান্তির অগ্নি আবার ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল।

রুস্ ও তুরস্কের সহিত বিবাদ চলিতেছিল, অচিরে সেই বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। ফরাসীসম্রাট লুই নোপলিয়নের সহিত মিলিত হইয়া, ইংলণ্ড, তুরস্ককে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ক্রিমিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রিমিয়া ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের বীরত্বের ক্ষেত্র,—স্কুটারীর হাঁসপাতাল তাঁহার গৌরবস্তম্ভ। আজ এত দিন পরে, এই দূরদেশে বসিয়াও, স্কুটারীর ভীষণ-দৃশ্যময় হাঁসপাতালের মুমূর্ষু রোগীর শয্যা-

পার্শ্বে, দীপ হস্তে সেই দেবী মূর্ত্তি যেন দেখিতে পাইতেছি। এদিকে যুদ্ধ ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করিতে লাগিল। জয় পরাজয়ে দুই পক্ষই ক্রমে হতবল হইতে লাগিলেন। ১৮৫৪ সালের ৫ই নবেম্বর ইংকারমানে শেষ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে রুষীয় ও ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ সৈন্য নিতান্তই হতবল হইয়া পড়িল। দুর্দ্দশার এইখানেই অবসান হয় নাই। ইংরাজেরা এই ক্ষীণবল লইয়াই সিবাষ্টপুল অবরোধ করা স্থির করিলেন, কিন্তু তাহার জন্য যে আয়োজন আবশ্যক তাহার কিছুই হইল না। এই সময়ে ইংরাজ শিবিরে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। একদিকে খাদ্য দ্রব্য এবং পরিচ্ছদের অভাব, আর একদিকে ক্রিমিয়ার নীহার ও দারুণ শীত। রুষের অস্ত্রে ইংরাজের যে ক্ষতি হয় নাই, ক্রিমিয়ার দারুণ নীহার পাতে এবং ভীষণ শীতে, তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইতে লাগিল। দুর্দ্দশার ভার পূর্ণ করিবার জন্য ওলাউঠা প্রভৃতি দারুণ রোগ ইংরাজ শিবিরে প্রবেশ করিল। ইংরাজের দুর্দ্দশা ও কষ্টের আর সীমা রহিল না। স্কুটারীর হাঁসপাতালের অবস্থা দিন দিন ভীষণতর হইতে লাগিল। যুদ্ধে আহত অসংখ্য সৈনিকদিগের দ্বারা স্কুটারীর হাঁসপাতাল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আবার নানাপ্রকার সাংঘাতিক রোগ প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ



দুইখানি ছবি।

(৩৮ পৃষ্ঠার পর।)

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকাল, একখানি সুন্দর ঘরে একটী যুবক প্রদীপের কাছে বসিয়া একখানা বই খুব মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। এই যুবক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হরিনাথ। তাহার মাতা ও ভগিনী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। যে কুটীরে হরিনাথের পিতার মৃত্যু হয় এ সে গৃহ নহে, হরিনাথ সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইস্থানে নূতন বাড়ী করিয়াছে। ঘরখানি অতি পরিষ্কার, কোথাও একটু ধুলা বা ময়লা নাই, বিছানা ইত্যাদি অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত, যেখানকার জিনিশ সেখানেই আছে, ঘরের বাসনগুলি সব পরিষ্কার, ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কতক্ষণ পরে বই রাখিয়া হরিনাথ উঠিল। মাকে ডাকিয়া বলিল "মা আজ আমার একটুকু দরকার আছে, লালমোহন বাবু ডাকাইয়াছেন।" এই বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় হরিনাথ ফিরিয়া আসিল। আজ তাহার মন আনন্দে পূর্ণ, লালমোহন বাবু তাহার কার্য্যদক্ষতা, সততা ও পরিশ্রমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপন ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়াছেন। এই সুখের সংবাদ লইয়া যখন সে গৃহে আসিল, তখন তাহার মাতা ও ভগিনীর আনন্দ কে প্রকাশ করিবে? একমাত্র পুত্র ও ভ্রাতার এই নূতন উন্নতি দেখিয়া তাঁহারা সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

যখন গরিবের কুটীর এইরূপ আনন্দে মগ্ন, তখন দত্ত বাবুদের বাড়ীতে স্থূল স্থূল কাণ্ড উপস্থিত। শচীকান্তের মাতা একখানি পত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মন ঘোর উদ্বেগে পূর্ণ। চক্ষু মুখ আরক্ত ও স্ফীত, দেখিলেই বোধহয় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে খুব কাঁদিয়াছেন। পত্র খানি শচীকান্তের, সম্মুখে খোলা রহিয়াছে তাহাতে এইরূপ লেখা :—

শ্রীচরণেষু, নাগপুর,
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২—

মা, এই পত্র পাইবাই আমাকে তার তিন-হাজার টাকা অবশ্য পাঠাইবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার ভয়ানক পীড়া হইয়াছিল, এখন ভাল হইয়াছি, কিন্তু এখনও বড় দুর্ব্বল আছি। আমার হাতে এখন কিছুই টাকা নাই, অবশ্য অবশ্য টাকা পাঠাইবেন, ভুলিবেন না আমি বাড়ী যাইব। ইতি—

সেবক,
শ্রীশচীকান্ত দত্ত

একবার, দুইবার, তিনবার, শচীকান্তের মাতা পত্র খানি পড়িলেন। পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন "এর মানে কি? একমাস হয় নাই, পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়াছি। দিবার সময় বলেছিলাম আর ছয় মাসের মধ্যে কিছু পাঠাবনা। আর আজ এই চিঠি। সে টাকা সব উড়াইয়াছে। আরও পাঠাইলে সেটাকাও উড়াইবে। আর না দিইবা কেমন করে? ভাবি অসুখ করিয়াছিল লিখিয়াছে, কি করি?" এই সময়ে দরজা খুলিয়া গেল। অমলা শচীকান্তের স্ত্রীকে লইয়া সেই ঘরে আসিল, হাতে একখানা চিঠি। চিঠিখানা দেখাইয়া অমলা বলিল "মা, দেখ শচী বউকে এই চিঠি লিখেছে।" "বউকে চিঠি লিখেছে? কি লিখেছে? কখন এল?" "এখনিই।" "চায় কি?" "টাকা" "কি, বয়ের কাছ থেকে? কত টাকা?" "আট হাজার।" "আট হাজার? কেন?"

শচীকান্ত তোমাকে সব কথা বল্‌তে বারণ করেছে। কিন্তু আর তোমার কাছে গোপন কর্‌বনা। আমরা অনেক দিন তার অনেক কথা গোপনে রেখেছি আর না। এপর্য্যন্ত তাকে আমার টাকা থেকে প্রায় দশ হাজার টাকা দিয়েছি।" "কেন? দশ হাজার টাকা। এতদিন আমায় বল নাই কেন?" "ভাল করি নাই। তার অনুরোধে এতদিন বলি নাই।" "কামাখ্যা বাবু জানেন?" "না। তিনি আমাকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করেন এত টাকা দিয়ে কি কর? আমি তার কোন উত্তর দিই না" "বউকে কি লিখিছে পড়ত।"

"—আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি তুমি উদ্ধার না করিলে আর উপায় নাই। এখানে আমার অনেকগুলি টাকা ধার হইয়াছে, না দিতে পারিলে আমার আর রক্ষা নাই। তুমি এই পত্র পাইয়াই যেমন করিয়া হউক আট হাজার টাকার সংস্থান করিয়া পাঠাইবে। দিদি অনেকবার আমাকে টাকা দিয়াছেন, তুমি তাহার কাছে চাহিও। মাকে কখনও জানাইও না। দিদি যদি দিতে না পারেন তবে তোমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে, বন্ধক দিয়া টাকা পাঠাইও। আমি এখানকার ধার শোধ করিয়া হায়দ্রাবাদ যাইব। সেখানে আমার এক প্রিয় বন্ধু—" "একি! আমাকে লিখিয়াছে যে তার বড় অসুখ করিয়াছিল এখন বাড়ীতে আসিবে, তাই তিন হাজার টাকা চায়। এর মানে কি?" "সব মিথ্যা কথা। মা, কি হবে এখন?" "কামাখ্যা বাবুকে আনিতে লোক

পাঠাও তিনি যা বলেন তাই হবে।" কামাখ্যা বাবু আসিয়া সব শুনিলেন। শচীকান্তের এতদূর অধোগতি হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহার মাতাকে আর টাকা পাঠাইবেন না এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। কামাখ্যা বাবুর কথা মত শচীকান্তের মাতা পত্র লিখিলেন। তাহার অসদ্ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করিলেন এবং অসৎকাজে ব্যয় করিতে আর টাকা পাঠাইবেন না লিখিলেন। ইহার পাঁচ ছয় দিন পরে নাগপুর হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। প্রকাণ্ড ভবনে হাহাকার ধ্বনি উঠিল, শচীকান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে। টাকা ব্যতীত সঙ্গীদের কাছে মুখ দেখাতে না পারিয়া গুলি করিয়া পাপ জীবন শেষ করিয়াছে।

পাঁচ লক্ষ টাকার অধিপতির পরিণাম এই! যে ধন মানুষকে এইরূপে অধোগমনের পথে লইয়া যায়, পাঠক, সেই টাকা পাইয়া তুমি আনন্দ করিবে কি শোক করিবে ভাবিয়া দেখ। অনেকে ধনহীন বলিয়া কত আক্ষেপ করেন কিন্তু ধন পাইয়া তাহার অহঙ্কারে আপাদ মস্তক পূর্ণ ও ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া মহাদম্ভে পৃথিবীতে বিচরণ করা এবং সৎপথ ত্যাগ ও অসৎপথ অবলম্বন করিয়া চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করা ইহাই যদি ধন লাভের পরিণাম হইল তবে সে ধনকে কি অস্পৃশ্য পদার্থের ন্যায় ত্যাগ করিব না?



বিভিন্ন জাতির অভিবাদন প্রথা।

বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা কত প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। এক জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা যে ভাব দেখাই, তাহাতে প্রকৃতই আমাদের মনের ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। এই মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতি, আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এবং এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতিতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীর প্রকৃতিরও অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

গুরুজন এবং মান্য ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা প্রণাম ও নমস্কার করিয়া থাকি, সমবয়স্কদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ইষৎ হাস্যের সহিত "ভাল ত?" "সংবাদ কি?" ইত্যাদি ছোট খাট দু একটী কথায় অভিবাদন করি; যাহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা আছে—বন্ধুত্ব আছে, যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহিত দেখা হইলে, হয়ত কোন কথাই বলি না,—একবার তাকাই বা একটু হাসি। এখানে আর অধিক কিছু আবশ্যক হয় না, একটু হাসিতে, একটু চাহনিতে, মনের ভাবটা সমস্তই প্রকাশ হয়। আমাদিগের প্রকৃতিতে বিনয়, নম্রতা এবং কোমলভাব অধিক, তাই আমাদের অভিবাদন প্রণালীও তদনুযায়ী।

এদেশের পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা সাক্ষাৎ হইলে, "রাম রাম" বলিয়া থাকে, এবং সেলাম করে; সেলামটা নমস্কারেরই প্রতিরূপ; কিন্তু একটু তফাৎ আছে। আমাদের প্রণাম ও নম-

স্কারে যতটা বিনয় ও নম্রতা আছে, ইহাতে যেন তাহা নাই; তাহার কারণ আমাদের অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের প্রকৃতিতে তেজ অধিক, আমাদের প্রকৃতি ভীরু, দুর্ব্বল ও কোমল। মুসলমানদিগের মধ্যে আদব কায়দাটা বড় বেশী, তাই প্রতিপদে তাহাদের সেলাম করা রীতি।

ইংরাজ জাতির প্রচলিত অভিবাদন প্রণালী হস্ত কম্পন। এই হস্ত কম্পনের ভাবেও কাহার কি প্রকার প্রকৃতি, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এক এক জন এমনি জোরে হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া দেয়, যে সমস্ত শরীরে সে ঝাঁকনি অনুভব করিতে হয়, বুঝিবে ইহাদের প্রকৃতিতে উৎসাহ উদ্যম খুব অধিক। এক এক জন হাতখানি ধরিয়া একটু কম্পিত করিয়া পরিত্যাগ করে, ইহাদের সেই হস্তকম্পনে যেন একটা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করা যায়, বুঝিবে ইহাদের মনে কোন ভাবই হয় না, যাহা করে কেবল ভদ্রতার দায়ে। যাহারা হাত খানা ধরিয়া একটু কম্পিত করিয়া, এবং হাতের পাতাটী একটু চাপিয়া পরিত্যাগ করে, বুঝিবে তাহাদের রীতি নীতি ও রুচি বিশেষ মার্জ্জিত। আর যাহারা হাত খানি লইয়া, হাতের পাতাটা জোরে চাপিয়া দেয়, বুঝিবে তাহাদের প্রকৃতিতে প্রীতি ও ভালবাসা খুব অধিক। সাধারণতঃ হস্তকম্পনে উৎসাহ, উদ্যম এবং প্রীতি ও সদ্ভাবের চিহ্ন প্রকাশ পায়। আমরাও আজ কাল হস্তকম্পন করিতে শিখিয়াছি কিন্তু সে আমাদের চিরকালের অনুকরণ-প্রিয়তার গুণে,—আমাদের প্রকৃতির সহিত ইহা মিলে না; হস্ত কম্পনে বিনয়, নম্রতার বড় অভাব।

হস্ত কম্পন ভিন্ন ইংরাজ জাতির আরও দুই একটি অভিবাদন প্রথা আছে। কাছাকাছি দেখা হইলেই হস্ত কম্পন সম্ভব হয়; কিন্তু যখন দূরে দূরে দেখা হয়, তখন মস্তকটী ইষৎ অবনত করা, বা হাতের ছড়ী ইষৎ উত্তোলিত করাই নিয়ম; কিন্তু যেখানে অধিক সম্মান দেখাইতে হইবে, সেখানে মাথার টুপি খোলা বিধি। এই টুপি খোলার ধরণেও ইহাদের প্রকৃতির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ খুব আস্ফালনের সহিত টুপি খোলেন,—অর্থাৎ টুপিটা মাথা হইতে তুলিয়া খুব উৎসাহের সহিত হস্ত বিস্তার করেন, বুঝিবে ইহাঁদের উৎসাহ, উদ্যম খুব বেশী। কেহ কেহ টুপিটী ঈষৎ উত্তোলিত করেন, বুঝিবে ইহাঁদের প্রকৃতি স্থির, ধীর ও রুচি মার্জ্জিত। কেহ কেহ টুপিটী খুলিয়া উল্টাইয়া ধরে, বোধ হয় যেন ভিক্ষা চাহিতেছে, কেহ কেহ বা কেবল টুপিটী স্পর্শই করেন, ভয় পাছে টুপি খুলিতে কেশ বিন্যাশ নষ্ট হইয়া যায়।

ফরাসীদেশে যাও, সেখানে দেখিবে এই টুপি খোলাই সেখানকার সাধারণ অভিবাদনের রীতি। ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদিগকে সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি দেখাইতে হইবে তাঁহাদিগকে দেখিলেই টুপি খোলা নিয়ম, কিন্তু এ সাধারণ-তন্ত্র ফরাসীদেশে প্রেসিডেণ্ট হইতে সামান্য মুটে মজুরকে পর্য্যন্ত টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিতে হয়। স্পেন দেশের কৃষিদিগের মধ্যে এক বিচিত্র নিয়ম দেখা যায়। ইহারা সকল সময়েই এক খণ্ড রুটী সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। কাহারও সহিত দেখা হইলে, এই রুটী দিয়া অভিবাদন করা ইহাদের নিয়ম। যাহাকে এই রুটী দিয়া অভিবাদন করা হয়, সে অবশ্য রুটীখণ্ড লয় না, এবং যে রুটী দিয়া অভিবাদন করে, সেও জানে যে সে ব্যক্তি রুটী লইবে না। যদি কেহ এই রুটি লয় তবে আর ইহাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। জর্ম্মণী এবং ইউরোপের আরও দুই এক স্থানে, পরিচয় থাক আর নাই

থাক, সাক্ষাৎ হইলে, কোন না কোন প্রকারে অভিবাদন করিতে হইবেএবং একটি কথা বলিতেই হইবে, নতুবা ইহারা সেটা নিতান্তই অভদ্রতা মনে করে। ফরাসী ও বেলজিয়ান্‌দের মধ্যে আলিঙ্গনটা বড়ই প্রচলিত; পুত্রের সহিত পিতার সাক্ষাৎ হইলে, বা বন্ধুর সহিত বন্ধুর দেখা হইলে সর্ব্বত্রই ইহারা চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া থাকে। মালয় এবং তন্নিনিকটবর্ত্তী দেশের লোকেরা দেখা হইলে, পরস্পরকে আঘ্রাণ করিয়া অভিবাদন করে। চীন দেশীয়দিগের অভিবাদন প্রণালী আট প্রকার। নূতন বৎসরের প্রথম দিনে দেখা হইলে, হাত যোড় করিয়া, মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া, অভিবাদন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দেখা হইলে "ভাত খাইয়াছ?" এবং তোমার পাকাশয়ের অবস্থা ভাল ত?" বলিয়া অভিবাদন করার রীতি আছে। জাপানীদিগের মধ্যে জানু অবনত করিয়া অভিবাদন, করাই সাধারণ রীতি কিন্তু সামান্য লোকের উচ্চ পদস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অন্য প্রকারে অভিবাদন করিবে। আফ্রিকার মুরদিগের মধ্যে অপরিচিত লোককে অভিবাদন করিবার প্রণালী যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর। একজন অপরিচিত লোক দেখিলে, ইহারা অশ্বে আরোহণ করিয়া, বেগে তাহার দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিবে, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল আওয়াজ করিবে; এই অদ্ভুত অভিবাদন প্রথা যাহার কাছে নূতন, সে হয়ত ভয়ে সেস্থান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে; কিন্তু পরে জানিতে পারে, যে মুরদিগের ইহাই অভিবাদন প্রথা। আফ্রিকার স্বর্ণ-উপকূলের লোকেরা বামদিকের স্কন্ধের কাপড় ঈষৎ উত্তোলন করিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে, কিন্তু যেখানে অধিক সম্মান দেখান দরকার, সেখানে সমস্ত বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিয়া দেখানই নিয়ম। ইজিপ্টের লোকেরা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, "ঘর্ম্ম কেমন হইতেছে" বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে।



টর্নেডো বা ঘূর্ণবায়ু।



মুষের জ্ঞান দিন দিন বাড়িতেছে, বিজ্ঞান শাস্ত্রে মানুষ প্রতিদিন উন্নতিলাভ করিতেছে। ক্ষণস্থায়ী আকাশের বিদ্যুৎ ধরিয়া মানুষ আপনার কাজে লাগাইতেছে, প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা না একটা কারণ বাহির করিতেছে। মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের ও গর্ব্বের আর সীমা নাই। মানুষের অহঙ্কার এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে মনে করিতেছে একদিন মৃতকেও বাঁচাইয়া তুলিবে। কিন্তু এক এক সময় প্রকৃতির এক একটী অদ্ভুৎ কাণ্ড দেখিয়া মানুষ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে—মানুষের সকল গর্ব্ব—অহঙ্কার, চূর্ণ হইয়া যায়। প্রকৃতির একটী সামান্য নিশ্বাসের প্রতিকূলে মানুষ দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না;—প্রকৃতির সামান্য

একটী নিশ্বাসে যে প্রলয় উপস্থিত করে, মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান কিছুই তাহাকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অথচ এই সামান্য জ্ঞানের কত অহঙ্কার!

গত ৭ই এপ্রেল ঢাকা এবং তন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে, যে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ? পলকে এমন প্রলয়ের কথা আমরা আর শুনি নাই,—হঠাৎ যেন বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না। পুস্তকেই পড়িয়াছিলাম,

"When oft in whirl the mad tornado flies,
Mingling the ravaged landscape with the skies."

কিন্তু সত্য সত্যই যে উন্মত্ত ঘূর্ণ বায়ুতে পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আকাশের সহিত মিশাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস হইত না। এবার ঢাকার যে ভীষণ-কাণ্ড হইয়াছে,তাহাতে যাহা অসম্ভব মনে করিতাম তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিলাম, এখন আর অবিশ্বাস করিবার যো নাই।

এই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি কি কারণে হইয়া থাকে, তাহা এখনও ঠিক বলিতে পারা যায় না, কারণ এদেশে ইহা নূতন। তবে ইউনাইটেড্ ষ্টেডের অনেকস্থানে মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণ বায়ু হইতে দেখা যায়, এবং সে দেশে যে কারণে হয়,বোধ হয় এদেশেও সেই কারণেই হইয়া থাকিবে। যাহা হউক ঘূর্ণ বায়ু সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। ছোট খাট ঘূর্ণ বায়ু আমাদের পাঠক পাঠিকারা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। সময় সময় বায়ুকে ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধদিকে বা সোজা ভাবে যাইতে দেখা যায়। কেবলমাত্র বায়ু হইলে, আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম না।কিন্তু ইহার মধ্যে ধূলা এবং অন্যান্য হাল্কা জিনিষ থাকে বলিয়া আমরা তাহা দেখিতে পাই। আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে ইহা ভূতের কাণ্ড, যাহারা ইহার কারণ না জানে, তাহারা ইহাকে ভূতের কাণ্ড মনে করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে; হয়ত আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যেও অনেকে ইহাকে ভূতের কাণ্ড মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ভূতের কাণ্ড নহে। প্রকৃতির সকল কার্য্যেরই যেমন একটা কারণ আছে—সকলই নিয়মে আবদ্ধ, ইহারও তেমনি একটা কারণ আছে। চন্দ্র সূর্য্যের উদয় ও অস্ত, মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুৎ—এ সকলেরই কারণ আছে, সকলই নিয়মের অধীন। ঐ যে ফুটন্ত ফুলটী সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, উহাও প্রকৃতির নিয়মের অধীন, এই যে ধীরে ধীরে বায়ু আসিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে, ইহাও প্রকৃতির আদেশে, আবার এই মৃদু সমীরণ নিমেষে ঝড় বা ঘূর্ণ বায়ুর আকার ধারণ করিয়া, যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত করিতেছে, তাহাও প্রকৃতির আদেশে।

যাহা হউক এই ছোট খাট ঘূর্ণ বায়ু—যাহা হয়ত গ্রীষ্মকালে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই,—এই ঘূর্ণ বায়ুরও যে কারণে উৎপন্ন হয়, সেদিন ঢাকায় যে ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়াছিল, সে ভীষণ ঘূর্ণ বায়ুও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়াছিল।

এক খণ্ড সোলা যদি হাতে লইয়া, জলের মধ্যে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, যে তৎক্ষণাৎ সোলা খণ্ড জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ এই যে সোলা খণ্ড জল অপেক্ষা হাল্কা বা লঘু। একটা বাটীতে খানিকটা তেল লইয়া, তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে, দেখা যায় যে তেলটা জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে; ইহারও কারণ—জল অপেক্ষা তেল লঘু। তবেই